চিত্রগ্রীব

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

লেখকের বিখ্যাত শিশু-উপন্যাস 'Gay-Neck'এর অনুবাদ।
আমেরিকায় বইটি শ্রেষ্ঠ শিশু-উপন্যাস বলিয়া
Newbury Prize প্রাপ্ত হয়।

অনুবাদক
স্নরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ

দাম এক টাকা বার আনা

শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্ত্তৃক এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
এর পক্ষে ১৪নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে
প্রকাশিত ও এইচ, এস, প্রেস, বরাহনগর হইতে
এস, আর, ব্যানার্জ্জি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অল্প বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের নিজের উপর নির্ভর করতে শেখা দরকার। তবেই তার আত্মসম্মানজ্ঞান প্রখর হবে, তবেই তার দ্বারা জীবনে বড়ো বা মহৎ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

শৈশব থেকেই পারতপক্ষে সকল কাজ নিজের হাতে করতে শেখা শিক্ষার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত। অন্যায় কাজ ছাড়া কোনো কাজেই লজ্জা নাই, নিজের খরচ নিজের উপার্জিত অর্থে চালানোতেই গৌরব—পরের দৌলতে আলস্যে দিন কাটানো লজ্জার কথা।

এই সত্য আমেরিকার লোকেরা যেমন বোঝে বোধ করি আর কোথাও তেমন নয়। সেজন্য সে-দেশের ছেলেমেয়েরা যতটা আত্মনির্ভর এমন আর কোনো দেশে দেখা যায় না। আমেরিকার অনেক নামজাদা লোকের জীবনী পড়লে দেখা যায় তাঁরা সকলেই গোড়ায় নানা অভাব ও কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছেন; আমরা যাকে ছোট কাজ বলি এমন সব হাতের কাজে লিপ্ত থেকে জীবিকা উপার্জন করেছেন, তারপরে ধীরে ধীরে অসীম অধ্যবসায় ও সাধনার বলে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করেছেন। গারফীল্ড্, লিংকন, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি অনেকের নাম ইতিহাসে অমর হয়ে আছে, অথচ তাঁরা সকলেই অতি হীন অবস্থা থেকে আত্মনির্ভরতার ফলে এত বড়ো সম্মানের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

সে কথা থাক। আপাতত যাঁর কথা বলবো তিনি বাঙালীর

ছেলে, তার নাম ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল জাপান দেশে। সে আজ অনেক দিনের কথা।—আঠারো উনিশ বছর হতে চল্লো। জাপানের রাজধানী তোকিও সহরে এদেশের অধিকাংশ ছাত্র তখন যে-বাড়ীতে ছিলেন, তার নাম ছিল "India House" বা 'ভারত-নিবাস'। সে বাড়ীতে ধনগোপালবাবু যখন উপস্থিত হলেন তখন তাঁর বয়স উনিশ বছর, কিন্তু তাঁকে দেখে তা মনে হয়নি। পাতলা ছিপছিপে শ্যামবর্ণ নিতান্ত অনভিজ্ঞ বালকের মত চেহারা। বুদ্ধি মাখানো মুখখানি স্নিগ্ধ সরল, বড়ো-বড়ো ভাসাভাসা চোখ দুটি ভারি সুন্দর। গায়ে তাঁর নীল সার্জের সাহেবী পোষাক, তার কাট ছাঁট মোটেই ভালো নয়, নিশ্চয় চাঁদনী বা বৌবাজারের দর্জির তৈরি।

অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে জানতে পারলুম তিনি যে কি পড়বেন বা শিখবেন তা ঠিক করে আসেন নি। বিদেশে থাকাব খরচপত্র কি করে চালাবেন তা-ও জানেন না—সত্যি কথা বলতে কি, মনে হল তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েই এসেছেন। তবু কিন্তু তাঁর ওপর রাগ বা বিরক্তি হল না, মনে মনে তাঁর সাহসের তারিফ করলুম। দিনে দিনে তাঁর প্রতি আমার স্নেহ বেড়েই চল্লো।

তাঁর বই পড়ার খুব সখ—সময় পেলেই আমরা দুজনে পড়াশুনা ও আলোচনা করতুম। বয়স কম হলেও তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি বড়ো কম ছিল না, বরং বয়সের অনুপাত বেশি রকমই ছিল। ইতিহাস ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের মাত্রা দেখে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারিনি।

মাসকয় পরে একদিন তিনি বল্লেন, জাপানে টাকা উপায়ের উপায় নেই, নিজের খরচ চালানো দায়। আমি ঠিক করছি আমেরিকায় যাবো।

আমেরিকা যাবার খরচ অল্প নয়, অথচ তাঁর শূন্য হাত, তাই তাঁর কথা শুনে অবাক হলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, টাকা কোথা? তিনি বল্লেন, তার জন্য ভেব না। জোগাড় ক'রে নেব' খন।

• কিছু কালের মধ্যেই তিনি তাঁর সঙ্কল্প কাজে পরিণত করলেন। য়োকাহামা বন্দর তোকিওর অদূরে অবস্থিত। সেখানে অনেক ভারতবাসী ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করেন। তাঁরা সঙ্গতিপন্ন লোক। তাঁদের কাছে কিছু কিছু সাহায্য নিয়ে পাথেয় মাত্র সংগ্রহ করে; ধনগোপালবাবু জাহাজের ডেকের সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর যাত্রী হয়ে একদিন আমেরিকা যাত্রা করলেন।

যথা সময়ে দেশে ফিরলুম। বহুকাল ধনগোপালবাবুর খোঁজ খবর নেই। মাঝে মাঝে তাঁর কথা মনে পড়তো, ভাবতুম আমেরিকায় পয়সা উপায় করে পড়াশুনা করা সহজ নয়, চিঠি পত্র দেবার সময় নিশ্চয়ই নেই! তা ছাড়া একখানা চিঠি পাঠাতেই খরচ দশ পয়সা, তা-ই বা আসে কোথা থেকে! তবুও জানতে ইচ্ছা হ'ত আমেরিকায় গিয়ে তাঁর হার হ'ল না জিত হল।

একদিন আমেরিকার ছাপ-মারা একটি বইয়ের পার্শেল হাতে এসে পৌঁছুলো। ধনগোপালবাবুই পাঠিয়েছেন দেখে খুব আনন্দ হ'ল কিন্তু কি বই? মোড়ক খুলে দেখি দুখানি ইংরেজি বই এবং সেই বই দুখানি ধনগোপালবাবুরই রচনা—একখানি কাব্য অপরখানি নাটক।

সেই দুখানি ছোট ছোট বই নিয়ে যিনি আমেরিকার

সাহিত্য ক্ষেত্রে একদিন ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন আজ তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার। বয়স্ক ও অল্পবয়স্ক দুরকম পাঠকের জন্যই তিনি অনেকগুলি বই রচনা করে সে দেশে খুব যশস্বী হয়েছেন। তাছাড়া আমেরিকার নানা সহরে তিনি আমাদের দেশের সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাও করে' থাকেন।

তাঁর বইয়ের মধ্যে "A son of Mother India Answers" বা "ভারত-মাতার ছেলের জবাব" সবচেয়ে বেশী বিক্রী হচ্ছে। তিন মাসের মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার বই কেটে গেছে। মিস্ মেয়ো আমেরিকার এক লেখিকা, তিনি "Mother India" বা "ভারত মাতা" নামে একখানি বই লেখেন। তাতে তিনি আমাদের দেশের মন্দ দিকটাই দেখিয়েছেন, ভালো দিকটা মোটেই দেখান নি। তাছাড়া সে বইয়ের এমন অনেক মিথ্যা কথা আছে যা পড়লে বিদেশের লোক আমাদের ঘৃণা করবে। "ভারত মাতার ছেলের জবাব" তার প্রতিবাদ। বইখানি এখন কলিকাতার দোকানেও বিক্রি হচ্ছে।

ধনগোপালবাবুর সকল বইয়ে আমাদের দেশেরই কথা আছে, কেবল একখানিতে সে দেশের কথা। সেই বইখানি পড়লে আমরা জানতে পারি, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মানুষ হবার চেষ্টায় তাঁকে কত কঠিন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল, কত লাঞ্ছনা ও দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁকে পদে পদে ঠেকে শিখতে হয়েছে।

আমেরিকায় বড়ো বড়ো ছেলেমেয়েরা সকলেই কোনো-না-কোনো কাজ করে অর্থ উপার্জন করে পড়ার খরচ চালায়। কিছুদিন কাজ করে হাতে কিছু টাকা হলে তারা ইস্কুল বা কলেজে

ভর্তি হয়। যতদিন টাকা না ফুরোয় ততদিন লেখা পড়া করে, হাত খালি হলে আবার কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এতে পড়াশুনার ক্ষতি হয় না, কারণ, সেখানকার কলেজে তিনমাসে একটি একটি বিষয়ের পড়া ও পরীক্ষা শেষ হয়। তারপর ছাত্রেরা নিজ নিজ সুবিধা অনুসারে আবার তিনমাসের খরচ সংগ্রহ করে' অপর একটি বিষয় পড়তে সুরু করে।

আমেরিকায় নানা রকম কাজ পাওয়া যায়। বাসন মাজা, রান্না, ঘরদোর ঝাঁটপাট, খাবার পরিবেশন প্রভৃতি সাংসারিক কাজ থেকে সুরু করে' বাগানের মালিগিরি বা শস্যক্ষেতে শস্য কাটা ফল তোলা পর্যন্ত। যার যেমন জোটে সে তেমনি কাজ করে। কিন্তু কাজ পেলেই ত চলে না, তা সুসম্পন্ন করা চাই। আনাড়িকে কোনো দেশেই কেউ পছন্দ করে না। সে দেশে কাজ পাওয়া যায় যেমন সহজে হারানোও যায় তেমনি সহজে।

ধনগোপালবাবুও বিভিন্ন সময়ে এমনি ধারা নানা কাজ করে নিজের খাওয়া-পরা ও পড়ার খরচ চালিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প আছে। একটি গল্প এখানে বলি —

একবার এক বিশপ বা ধর্মযাজকের কাছে মালির কাজে তিনি বাহাল হন। তখনো তিনি আমেরিকার হালচাল জানেন না। বিশপের সঙ্গে রেলগাড়িতে তিনি তাঁর কর্মস্থানে যাত্রা করলেন। আমেরিকার রেলগাড়ীতে দুটি মাত্র শ্রেণী—'পুলম্যান' ও সাধারণ শ্রেণী। 'পুলম্যানে' ধনী লোকেরাই চড়েন, কারণ খরচ বেশী। সেখানে আরাম ও সুবিধা প্রচুর—ওমরাহী কাণ্ড বল্লেই চলে। বিশপ তাঁকে নিয়ে 'পুলম্যানে' উঠলেন।

ধনগোপালবাবুর 'পুলম্যানে' ভ্রমণ সেই প্রথম। প্রথম বিপদ উপস্থিত হল খাবার টেবিলে। হরেক রকমের ছুরি কাঁটা চামচ— কোন্‌টি কখন কি খেতে ব্যবহার করতে হয় তা তিনি জানেন না। ব্যাপার দেখে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়লেন। টেবিলে পরিবেশনকারী 'বয়েরা' ধোপদুরস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাকে নিঃশব্দে তাদের কাজ করছে—যেন এক একটি যন্ত্র। 'বয়' তাঁদের সামনে প্লেটে করে 'অয়ষ্টার' রেখে গেল। খাদ্য হিসাবে, সে দেশে, 'অয়ষ্টার' বা ঝিনুকের শাঁসের খুব কদর। একখানা চামচ দিয়ে যেই ধনগোপালবাবু খেতে সুরু করেছেন অমনি 'বয়' হাঁ-হাঁ করে' ছুটে এসে তাঁর হাত থেকে চামচটি কেড়ে নিলে। তারপর যে-যন্ত্রটি দিয়ে খাওয়া নিয়ম সেটি তাঁর হাতে গুজে দিয়ে গেল। 'বয়' যে বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিল তা বেশ বোঝা গেল—'অয়ষ্টার' খেতে জানে না এমন বর্বর 'পুলম্যান' চাপে কোন্ সাহসে ?

আহার কোনোগতিকে শেষ হল, এবার শোবার পালা। তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট বেঞ্চিখানা 'বয়' তাঁকে দেখিয়ে দিলে। সেটা উপরে, তার ঠিক নীচের বেঞ্চিতে অপর এক আরোহীর স্থান। অনেক কষ্টে যদি বা সেখানে উঠলেন, কিন্তু পায়ের জুতোই বা খোলেন কি করে, আর তা রাখেনই বা কোথা, এই হল সমস্যা। তলা দিয়ে লোকেরা যাতায়াত করছে আর বোকার মত তিনি পা ঝুলিয়ে বসে আছেন। কি যে করবেন কিছুই ভেবে ঠিক করতে না পেরে তাঁর বিষম লজ্জা করতে লাগলো। শেষে লক্ষ্য করলেন, চাকর ডাকবার ঘণ্টা টিপলে সেই বয়টি

আসে যে খাবার পরিবেশন করেছিল। অগত্যা তিনিও ঘণ্টা টিপলেন। 'বয়' এসে গম্ভীরভাবে তাঁর আপাদ মস্তক একবার দেখে নিলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই? তিনি বল্লেন, জুতো রাখবো কোথা? বিনা বাক্যব্যয়ে 'বয়' তাঁর পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে চলে গেল। আবার দুশ্চিন্তা—জুতো নিয়ে ভাগলো নাকি? পোষাক ছাড়া যায় কি করে? এ যে হিতে বিপরীত হল—এখন যে খালি পায়ে আর নামবারও উপায় রইলো না—এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! তার কান্না পেতে লাগলো, ভাগ্য-গতিকে ঠিক সেই সময় বিশপ ফিরে এলেন চুরুট খাবার ঘর থেকে, এসে বুদ্ধি বাংলে দিয়ে তাঁকে তখনকার মত উদ্ধার করলেন।

বিশপের বাড়ী পৌঁছে বাগান দেখে তাঁর চক্ষুস্থির। এরই নাম বাগান? এ যে বিষম ব্যাপার! বিঘের পর বিঘে জুড়ে রকমারি অসংখ্য ফল ও ফুলের গাছ। এরই খবরদারি তাঁকে করতে হবে—মনটা বিষম দমে' গেল। বাগান দেখাতে দেখাতে বিশপ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন মালীর কাজ করা সুবিধা হবে ত? তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেও একটা ঢোক গিলে বল্লেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!

বাগানের সর্দার-মালী এক কাফ্রি—প্রকাণ্ড লম্বাচওড়া কুচকুচে কালো চেহারা, যেন যমদূত! তার সঙ্গে একদিন তর্ক হয়ে গেল। সে বল্লে গোলাপ ফোটে গ্রীষ্মকালে। ধনগোপালবাবু বল্লেন, আমাদের দেশে ফোটে শীতকালে। কাফ্রি খাপ্পা হয়ে উঠলো, বল্লে, বাজে বোকো না, তা আবার কখনো হয়? চাকরি করতে এসে সর্দারের মন জুগিয়ে চলতে হয় ধনগোপালবাবুর,

সে শিক্ষা তখনো হয়নি। তিনি বিরক্ত হয়ে বল্লেন, নিশ্চয় হয়। আমার দেশের কথা আমি জানি না? কাফ্রিও চ'টে উঠলো, বল্লে, তাই যদি, তবে মরতে এখানে এসেছ কেন? সেখানেই ফিরে যাও।

বিশপ অল্পদিনের মধ্যেই বুঝলেন, মালীর কাজ চালানো তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়। তখন তিনি তাঁকে বাড়িতে বাসন-মাজা কাজে বাহাল করলেন। কিছুদিন সেখানে কাজ করার পর আবার একদিন কি একটা তুচ্ছ ব্যাপারে কাফ্রির সঙ্গে তর্ক বাধলো। সেদিন সে একেবারে মারমূর্তি হয়ে তাঁকে 'মিথ্যাবাদী' বলে' গাল দিলে। আর সহ্য হল না, ধনগোপালবাবু কাজে ইস্তাফা দিলেন। বিশপ অতি ভদ্রলোক, সমস্ত শুনে তিনি তাঁর পাওনা তখনি চুকিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, আর যাবার একখানি ট্রেনের টিকিটও তাঁকে কিনে দিলেন।

আমেরিকার ছেলেমেয়েদের জন্যে ধনগোপালবাবু এ পর্যন্ত চারখানি বই লিখেছেন।* সে দেশে বইগুলির খুব আদর। আমাদের দেশের বিবিধ জিন্তু জানোয়ার ও সাপুড়ে, বাজিকর, বোম্বেটে বা জলদস্যু, শিকারী প্রভৃতির অনেক আশ্চর্য গল্প প্রথম তিনখানি বইয়ে আছে। বইগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন চোখের সামনে এ-দেশের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত নদ-নদী, বাজার ও মেলা, রং-বেরঙের পোষাকে নানারকম মানুষ সমস্তই দেখতে পাচ্ছি। সেখানকার কত শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি, কত গন্ধ যেন আমাদেরই

* Jungle Beasts & Men, Kari, the Elephant, Hari the Jungle Lad, Gay-neck,

আশেপাশে বাতাসে ভাসছে। ছেলেবুড়ো সব মানুষগুলোই যেন আমাদের চেনা-চেনা, এমনি তারা স্বাভাবিক।

ন' বছরের একটি ছেলে, তার বন্ধু হল পাঁচ মাসের বাচ্চা-হাতী। হাতীর পিঠে ছেলেটি কত জায়গায় যায়, কত ব্যাপার দেখে। হাতী নদী থেকে জলে-ডোবা ছেলেকে উদ্ধার করে, বাজারের মাঝ দিয়ে যেতে যেতে দোকান থেকে কলা চুরি ক'রে খায়, জঙ্গলের বাঘের মুখে পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। বাঘ শিকার, চোরাবালির বিপদ, ক্ষেপা হাতী, গ্রামে মানুষ-খেকো বাঘের আবির্ভাব, বাণ-ডাকা এমনি সব ভয়ের গল্প পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা ছায়। এক জায়গায় রাতের জঙ্গলের কথা আছে। সেখানে জন্তু-জানোয়ারের অবিরাম লড়াই চলছে, চারিদিকে বিষম উত্তেজনা। কতক জন্তু মরে কতক বা আহত হয়। তাদের গা থেকে ঝরঝর করে' রক্ত ঝরে, পায়ের তলায় মাটি লাল হয়ে ওঠে। কারও শিং কারও দাঁত কারও হাত-পা ভাঙে, কেউ ধরাশায়ী হয়ে তখনি মরে, কেউ আবার লড়াইয়ে হেরে আর্তনাদ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে ছুটে পালায়। জোর যার মুলুক তার।

আমেরিকায় একটি সমিতি আছে, তার নাম American Library Association বা 'আমেরিকার লাইব্রেরী সমিতি'। প্রতি বৎসর আমেরিকায় প্রকাশিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে যে বইখানি ঐ সমিতির বিচারে শ্রেষ্ঠ নিরূপিত হয় তার লেখককে তাঁরা একটি পুরস্কার দেন। পুরস্কারের নাম John Newbery Medal। ১৯২৭ সালের এই পুরস্কার ধনগোপালবাবু পেয়েছেন তাঁর "Gay-neck" বা "চিত্রগ্রীব" বইয়ের জন্ম।

বইখানির প্রধান চরিত্র একটি পায়রা, তার নাম "চিত্রগ্রীব"। তার জন্ম হয় কলিকাতা সহরে। তার মা-বাবার সাহায্যে সে খাওয়া ওড়া প্রভৃতি থেকে সুরু করে আকাশ থেকে পথ চিনে প্রভুর বাড়ীর ছাতের ওপর নামতে পর্যন্ত শিখলে। তারপর ক্রমশ বাজপাখী ও ঈগলপাখীর আক্রমণ এড়াবার উপায় শিখে নিলে। এমন সময় আকাশে মায়ের সঙ্গে ওড়বার সময় একদিন তার মা বাজপাখীর আক্রমণে মারা গেল। মায়ের মরণ দেখে তার মনে এমন ভয় হল যে তার ফলে সে প্রায় অকর্মণ্য হবার জোগাড়। শেষে এক পাহাড়ী লামার কৃপায় সেই ভয় থেকে মুক্ত হয়ে নিজে শক্তির উপর তার অসীম বিশ্বাস জন্মালো—সে ক্রমে ক্রমে হাজার পায়রার দলপতি হল। সেই সময়ে সে এক শিকারীর সঙ্গে ফরাসী দেশে গিয়ে পৌছুলো—সেখানে তখন য়ুরোপের মহাযুদ্ধ চলছে। "চিত্রগ্রীব" সাহস ও বুদ্ধিবলে অল্পকালের মধ্যেই যুদ্ধের হরকরার কাজে দক্ষ হয়ে উঠলো। সেই কাজ করতে করতেই একদিন সে গুলির ঘায়ে আহত হয়ে নীচে পড়ে গেল। সৌভাগ্যক্রমে সে-জায়গাটা ছিল মিত্রপক্ষের দখলে। সেখানে সেবা-শুশ্রূষার পর একটু সুস্থ বোধ করলে সে দেশে ফিরে এল। কিন্তু তার শরীর ও মন ভেঙে গিয়েছিল, আবার মনে ভয় ঢুকেছিলো,—মনের অশান্তিতে সে ভাবতে লাগলো আর কখনো সে আকাশে উড়তে পারবে না। এই অশান্তি ও ভয় থেকে পাহাড়ী লামা তাকে দ্বিতীয়বার উদ্ধার করলেন—তাঁর কৃপায় তার শরীর ও মন আবার নীরোগে ও সবল হয়ে উঠলো। আবার সে কলিকাতার বাড়ীর ছাতের ওপর শিকারী ও তার প্রভুর সঙ্গে এসে মিলিত হল।

এই হল খুব সংক্ষেপে "চিত্রগ্রীবে"র গল্প।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রীব

এক

আমার এক বন্ধুর নাম ছিল 'করি'—সে একটি হাতী। অপর বন্ধুর নাম ছিল 'চিত্রগ্রীব'—সে একটি পায়রা। চিত্রিত বা রঙিন গ্রীবা যার তাকেই বলে চিত্রগ্রীব।

অবশ্য, চিত্রগ্রীব এমনি রঙিন ঝিকমিকে গলা নিয়ে ডিম থেকে বার হয়নি; হপ্তার পর হপ্তা ধরে তার পালক গজিয়েছে। তার বয়স তিন মাস পূর্ণ হবার আগে এক রকম আশাই ছিল না যে তার গলার রোঁয়ার অমন জৌলুস বার হবে। কিন্তু সে যাই হোক, জৌলুস যখন বার হল, তখন সহরে তার আর জুড়ি মিলল না। যদিও সহরের ছেলেদের, দুটি দশটি নয়, মোটমাট চল্লিশ হাজার পায়রা ছিল।

প্রথমে চিত্রগ্রীবের মা বাপের কথা বলি শোন। তার বাপ ছিল এক গেরোবাজ—সে বিয়ে করেছিল তখনকার এক সেরা সুন্দরী পায়রাকে। এক পুরানো বনেদি 'হরকরা' বংশে সেই সুন্দরীর জন্ম। তাই চিত্রগ্রীব পরে যুদ্ধ ও শান্তির সময় হরকরার কাজে এত কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিল। মায়ের কাছ থেকে সে পেয়েছিল বুদ্ধি আর বাপের কাছে পেয়েছিল সাহস আর তৎপরতা। তার উপস্থিত বুদ্ধি এমন প্রখর ছিল যে কখনো কখনো সে বাজ পাখীর আক্রমণ এড়িয়েছে, শেষ মুহূর্তে শত্রুর মাথার উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে। সে-সব কথা যথাস্থানে আর যথাসময়ে বলবো।

চিত্রগ্রীব

চিত্রগ্রীব যখন ডিমের মধ্যে, তখন সে অল্পের জন্য কি বাঁচনটা বেঁচেছে একবার শোনো। সে দিনের কথা কখনো ভুলবো না। সে দিন আমারি দোষে, তার মায়ের পাড়া দুটি ডিমের একটি ভেঙ্গে গেল। আমার বিষম বোকামি তাতে আর সন্দেহ নাই। এখনো সে জন্য দুঃখ হয়। কে জানে, হয়ত সেই ভাঙ্গা ডিমের সঙ্গে জগতের সব চেয়ে সুন্দর পায়রাটি ধ্বংস হয়ে গেল। ব্যাপারটি হয়েছিল এই—আমাদের বাড়ী চারতলা উঁচু, তারি ছাতের উপর পায়রার ঘর। ডিম পাড়ার কয়েক দিন পরে পায়রার খোপটি সাফ করবো স্থির করলুম। চিত্রগ্রীবের মা ডিমের উপর বসে' তা দিচ্ছিল। তাকে আস্তে আস্তে তুলে ছাতের উপর আমার পাশে রাখলুম। তারপর ডিমগুলি একে একে সন্তর্পণে তুলে পাশের খোপে খুব সাবধানে রেখে দিলুম। খোপের মেঝে শক্ত কাঠের—তার উপর খড়কুটো কিছুই ছিল না। তারপর আঁতুড়-খোপের আবর্জনা ফেলতে সুরু করলুম। সে কাজ শেষ হলেই একটি ডিম বার করে' নিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলুম। তারপর হাত বাড়িয়ে অপর ডিমটি আলগোছে অথচ বেশ বাগিয়ে ধরলুম। ঠিক সেই সময় আমার মুখের উপর কি একটা ঝপাৎ করে এসে পড়লো—মনে হল যেন ঝড়ে ছাত ধ্বসে পড়েছে। চিত্রগ্রীবের বাপ প্রাণপণ শক্তিতে তার ডানা আমার মুখে আছড়াচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার একটি পায়ের নখ রয়েছে আমার নাকের উপরে। ব্যথায় কাতর হয়ে হকচকিয়ে গিয়ে কেমন করে যে ডিমটা হাত থেকে খসে পড়লো টের পেলুম না। পাখীটাকে মাথা ও মুখের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলতেই তখন

ব্যস্ত ছিলুম। সে যখন উড়ে পালালো তখন দেখি ছোট ডিমটি আমার পায়ের কাছে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। তার সেই গোঁয়ারগোবিন্দ বাপটার উপর যেমন, তেমনি নিজেরও উপর বিষম রাগ হ'ল। নিজের উপর কেন? না, পাখীর বাপের আক্রমণের জন্য আমার প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল। সে ভেবেছিল আমি ডিম চুরি করছি, আমার মতলব না জেনে আমাকে বাধা দেবার জন্য সে নিজের জীবন বিপন্ন করেছিল, অতএব, পাখীদের ডিম পাড়ার সময় যদি কখনো পাখীর বাসা সাফ্ করতে যাও, তবে হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থেকো।

এখন আবার আমাদের গল্প সুরু করা যাক। চিত্রগ্রীবকে জগতে আনবার জন্য কবে ঠোঁট দিয়ে ডিমের খোলা ভেঙে ফেলতে হবে, সে কথা তার মায়ের অজানা নয়। বাপ-পাখী যদিও সকাল থেকে সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত প্রতিদিন ডিমে তা' দেয়, তবুও সে বোঝে না কখন তার বাচ্চা জন্মাবে। মা-পাখী ছাড়া আর কেউ সে খবর পায় না। আমরা এখনো বুঝি না কি রকম সেই বেতার খবর, যার দ্বারা সে বুঝতে পারে যে ডিমের খোলার মধ্যেকার হলদে আর সাদা জিনিষ পাখীর ছানায় পরিণত হয়েছে। সে আরো জানে কেমন করে ঠিক জায়গায় ঠোকর দিতে হবে, যাতে করে ডিমের খোলটি ভেঙে যাবে, অথচ বাচ্চার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। আমার কাছে এ এক অলৌকিক ব্যাপার।

এমনি ভাবে ত চিত্রগ্রীবের জন্ম হ'ল। ডিম পাড়ার আন্দাজ দিন কুড়ি পরে লক্ষ্য করলুম মা-পাখী ডিমের উপর আর বসে নেই।

বাড়ির ছাতের উপর থেকে যতবারই বাপ-পাখী উড়ে এসে ডিমের উপর বস্‌তে যায় ততবারই সে তাকে ঠুকরে তাড়িয়ে দেয়। অবশেষে বাপ বক্‌-বক্‌কুম করে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন?"

উত্তরে মা তাকে আরো ঠোকরাতে লাগলো। তার মানে, "লক্ষ্মীটি, যাও এখন! দেখছো হাতে এখন মস্ত কাজ!"

তখন বাপ উড়ে চলে গেল। আমার ভাবনা হল, সন্দেহ হতে লাগলো ডিমটা হয়ত ফুটবে না, কিন্তু ফোটা যে চাই-ই, নইলে আমার শান্তি কোথা! কৌতুহল ক্রমে বেড়ে চললো, পায়রার খোপের উপর থেকে আর চোখ ফেরাতে পারি না। এমনি করে এক ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু কিছুই ঘটলো না। দ্বিতীয় ঘণ্টারও প্রায় তিন ভাগ কাবার হয়, এমন সময় মা তার মাথা এক দিকে ফিরিয়ে কি যেন শুনতে লাগলো, সম্ভবত সেই ডিমের মধ্যে একটা নড়াচড়ার শব্দ। তার পর সে একটু চমকে উঠলো। মনে হল তার সারা দেহের মাঝ দিয়ে যেন একটা কাঁপুনি বয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন মন স্থির করে ফেল্লে। এইবার সে মাথা তুলে টিপ করলে। ঠোঁটের দুটি আঘাতে সে ডিমের খোলা ফাটিয়ে ফাঁক করে ফেল্লে—তার ভিতর দিয়ে দেখা গেল এতটুকু একটি পাখী, সবটাই যেন ঠোঁট আর একরত্তি কম্পিত দেহ! তার মার দিকে চেয়ে দেখি সে যেন অবাক হয়ে গেছে। এতদিন ধরে এরই আশায় সে কি বসে ছিল? আহা, কত ছোট, কি অসহায়! তার পানে চেয়ে চেয়ে শাবকের অসহায়তা বুঝতে পেরে বুকের কোমল নীল রোঁয়া দিয়ে সে তাকে ঢেকে দিলে।

দুই

পাখীর জগতে দুটি মধুর দৃশ্য আছে। প্রথম—মা যখন ডিম ভেঙে তার বাচ্ছাকে প্রকাশ করে; দ্বিতীয়—যখন সে তাকে ডানা দিয়ে জড়িয়ে থাকে আর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে খাওয়ায়। বাপ-মা দুজনেই চিত্রগ্রীবকে পরম স্নেহে জড়িয়ে থাকতো। মানুষের শিশুকে কোলে পিঠে নিয়ে টেপাটেপি করে আদর করলে যা ফল, বাপমায়ের পাখার বেষ্টনে চিত্রগ্রীবেরও তাই হয়েছিল। অসহায় শিশু এর দ্বারা গরমে থাকে—আরাম পায়। শিশুর পক্ষে খাদ্য যেমন প্রয়োজন, এই আদরও তেমনি। এই সময়ে খোপের মধ্যে বেশি খড়কুটো রাখা উচিৎ নয়—ক্রমেই তার পরিমাণ কমিয়ে আনা উচিত, যাতে করে খোপ বেশি গরম হয়ে উঠতে না পারে। নির্বোধ পায়রার মালিকেরা বোঝে না যে বাচ্ছা যত বাড়তে থাকে তার দেহের তাপের পরিমাণও সেই অনুপাতে বেড়ে চলে। এ সময়ে খোপ ঘন ঘন পরিষ্কার না করাই ভালো। পায়রার বাপ-মা খোপের মধ্যে যা কিছু রাখে, তা তাদের বাচ্ছার আরামের জন্যই, এ কথা বুঝতে হবে।

বেশ মনে পড়ে, জন্মের দ্বিতীয় দিন থেকে যখনই বাপ-মার মধ্যে এক জন কেউ খোপের মধ্যে উড়ে আসতো, তখন কেমন করে বাচ্ছার ঠোঁট দুখানা আপনা আপনি ফাঁক হয়ে যেত; আর তার লাল টুকটুকে দেহ হাপরের মত ফেঁপে ফুলে উঠতো। তখন বাপ কিম্বা মা তার হাঁ'র মধ্যে নিজের ঠোঁট পুরে দিয়ে দুধ ঢেলে দিত—

তাদের-খাওয়া ভুট্টা-বীজ সেই দুধে পরিণত হয়েছে। আমি লক্ষ্য করলুম—বাচ্ছার মুখে যে খাবার ঢেলে দিলে তা খুব নরম। বাচ্ছার বয়স যখন প্রায় এক মাস, তখনো পায়রা তাকে কোনো কঠিন বীজ খেতে দেয় না—আপন গলার মধ্যে কিছুকাল বীজটি রাখার ফলে যখন তা নরম হয়ে যায়, তখনি তা বাচ্ছার হজমের উপযোগী হয়।

চিত্রগ্রীব জবর খাইয়ে। বাপ-মায়ের এক জনকে নিত্য তার খাবার যোগাড়ের কাজে ব্যস্ত থাকতে হ'ত। অপর জন তখন হয় তাকে জড়িয়ে নয় তাকে আগলে বসে থাকতো। আমার মনে হয় বাপ বাচ্ছার জন্য মায়ের চেয়ে কিছু কম খাটতো না—বা তাকে কম আদর করতো না। তার দেহ যে খুব হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে উঠবে তা'তে আশ্চর্য্য কি! তার লাল মাংসের রং বদলে গিয়ে হলদে-হলদে সাদায় পরিণত হল—এটি পালক ওঠার প্রথম লক্ষণ। তার পর তার স্থানে এল খোঁচা খোঁচা সাদা পালক—গোলাকার, কতকটা সজারুর কাঁটার মত শক্ত। তার চোখ আর মুখের ধারে হলদে হলদে যে পদার্থ ঝুলে ছিল, তা খসে গেল। ধীরে ধীরে ঠোঁট বার হয়ে এল—শক্ত, ধারালো আর লম্বা। কি জোরালো তার চোয়াল!

হপ্তা তিনেক যখন তার বয়স, তখন একদিন সে খোপের দরজায় বসে আছে, এমন সময় একটা পিঁপড়ে তাকে পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছে। কারো কাছে কোন শিক্ষা পায়নি, তবু সে তাকে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করলে। অমনি গোটা পিঁপড়েটা দু' টুকরো হয়ে গেল। চিত্রগ্রীব মরা পিঁপড়েটার উপর নাক নামিয়ে আপন কীর্ত্তি লক্ষ্য করে দেখতে লাগলো। কালো পিঁপড়েটাকে সে বীজ

মনে করেছিল, এতে আর সন্দেহ নাই। ভুলক্রমে সে এক নিরীহ পথিককে হত্যা করেছে, যে তার জাতের মিত্র বই শত্রু নয়। আমরা আশা করতে পারি কৃতকর্মের জন্য সে লজ্জিত হল! যাই হোক, জীবনে আর কখনো সে পিঁপড়ে মারেনি।

হপ্তা পাঁচেক বয়সে সে খোপ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বার হয়ে খোপের সামনে জলের মালসা থেকে জল খেতে আরম্ভ করলে। এখনো বাপ-মাই তাকে খাওয়ায়, যদিও রোজ সে নিজেই খাবার সংগ্রহ করবার চেষ্টা করে। আমার হাতের কব্জির উপর বসে আমার হাতের তালুর উপর থেকে একটি করে বীজ সে ঠুকরে তুলে নেয়। বাজিকর যেমন করে শূন্যে বল ছুঁড়ে দেয়, সে তেমনি করে গলার মধ্যে বীজটি বার দুই তিন লোফালুফি করে গিলে ফেলে। এমনি করার পর প্রত্যেক বার সে মাথা ফিরিয়ে আমার চোখের পানে চায়—যেন বলে, "কেমন করছি? ভালো নয়? রোদ পোহান'র পর মা-বাবা ছাত থেকে নামলে বোলো কত আমার বুদ্ধি!" তবুও আমার অন্য পায়রার তুলনায় তার শক্তির বিকাশ খুব ধীরে ধীরে হয়েছিল।

ঠিক সেই সময়ে আমি এক আবিষ্কার করলুম। আগে জানতুম না, পায়রারা কেমন করে আঁধির মধ্যে উড়েও অন্ধ হয় না। নিরত চিত্রগ্রীবের বাপ লক্ষ্য করতে করতে একদিন নজরে পড়লো তার চোখের উপরে একটি পাতলা পরদা। ভাবলুম তার চোখে বুঝি ছানি পড়ছে—সে বুঝি দৃষ্টিশক্তি হারাতে বসেছে। আতঙ্কে হাতখানা বাড়িয়ে দিলুম, তাকে মুখের কাছে টেনে এনে ভালো করে পরীক্ষা

করবার জন্য। যেই তেমনি করা অমনি সে তার সোনালি চোখ খুলে ফেলে খোপের পিছন-পানে টুপ করে সরে গেল। তবুও তাকে আমি চেপে ধরে ছাতের উপর নিয়ে গেলুম, তারপর বৈশাখের জ্বলন্ত সূর্যের আলোয় তার চোখের পাতা খুব ভালো করে পরখ করলুম। হাঁ, রয়েছে বটে। তার চোখের পাতার সঙ্গে আর একখানা পাতলা পর্দা লাগানো—ঘুড়ির কাগজের মত ফিনফিনে। যতবারই তার মুখ সূর্যের পানে ফিরিয়ে দিই, তত বারই সে তার সোনালি চোখের তারাদুটির উপর সেই পাতলা পর্দাটি টেনে দেয়। এমনি করে আমি জানতে পারলুম যে এই পর্দাখানি তার চোখ রক্ষা করে--এরি সাহায্যে ওই পাখী আঁধির মাঝে বা সোজা সূর্যের পানে উড়তে পারে।

দু' হপ্তা বাদে চিত্রগ্রীব ওড়ার শিক্ষা পেলে। পাখী হয়ে জন্মালেও সে শিক্ষা খুব সোজা হয়নি। মানুষের ছেলেপুলে জল ভালোবাসে, তবুও তারা কত ভুল করে কত জল গিলে তবে সাঁতার শেখে। আমার পায়রার বেলাও তেমনি। ডানা খুলতে তার একটু ভয় ভয় করতো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে আমাদের ছাতের উপর বসে থাক্‌তো, আকাশের বাতাস তার চারিপাশে বয়ে যেত, তবুও তাকে ওড়ার নেশা ধরাতে পারতো না। আমাদের ছাতের বর্ণনা দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। ছাতের চারিধারে পাকা পাঁচিল চৌদ্দ বছরের ছেলের মত উঁচু। এই বাধা থাকায়, ঘুমের ঘোরে কেউ চলে বেড়ালেও চারতলার ছাতের উপর থেকে পড়বার সম্ভাবনা ছিল না। গ্রীষ্মের রাতে আমরা প্রায় সকলেই ছাতের উপর ঘুমোতুম।

চিত্রগ্রীব

প্রতিদিন সেই পাকা পাঁচিলের উপর চিত্রগ্রীবকে বসিয়ে দিতুম। বাতাসের পানে ফিরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেখানে বসে থাকতো—বাস্ ওই পর্য্যন্ত! একদিন ছাদের উপর কতকগুলো পায়রা-মটর ছড়িয়ে দিয়ে লাফিয়ে নেমে সেগুলো খেতে ইঙ্গিত করলুম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে কিছুক্ষণ আমার পানে চেয়ে রইলো। আমার দিক থেকে ফিরে সে আবার মটরগুলোর পানে নীচু হয়ে দেখতে লাগলো। কয়েকবার সে এই রকম করলে। শেষ পর্যন্ত যখন নিশ্চিন্ত বুঝতে পারলে যে ওই সুখাদ্যগুলি আমি তার মুখে তুলে ধরবো না, তখন সে পাঁচিলের উপর হেঁটে বেড়াতে লাগলো, মাঝে মাঝে হাত দুই নীচে মটরগুলোর পানে গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে। মন স্থির করতে না পেরে প্রায় পনরো মিনিট যন্ত্রণা ভোগ করার পর সে লাফিয়ে পড়লো। দুই পা ছাতের উপর যেই লাগা অমনি বন্ধ ডানা ছড়িয়ে বিলকুল খুলে গেল, তারি উপর ভর দিয়ে মটরগুলোর উপর সে তাল সামলে স্থির হয়ে দাঁড়ালে। কেরামতি বটে!

সেই সময় নাগাদ তার পালকের রঙের বদল চোখে পড়লো। একটা অনির্দিষ্ট ফিকে নীলের জায়গায় তার সর্বাঙ্গে যেন সমুদ্রের রং ফুটে উঠলো। হঠাৎ একদিন সকালে দেখি তার গলা ঝিকমিক করছে—রামধনুর সাতরাঙা গুটির মতন।

এইবার সব সেরা কাজ ওড়ার সময় এলো। প্রথম শিক্ষা দেবে তার বাপ-মা—আমিও সাধ্যমত শেখাতে লাগলুম। প্রতিদিন কয়েক মিনিটের জন্য আমি তাকে কব্জির উপর বসাই, তারপর হাতখানা

অনেকবার উপর নীচে করে দোলাতে থাকি। সেই অস্থির দাঁড়ের উপর আপনাকে স্থির রাখবার চেষ্টায় তাকে ঘনঘন ডানা খুলতে ও বন্ধ করতে হয়। এতে তার উপকার হয়, কিন্তু আমার শিক্ষার ওখানেই শেষ। হয়ত তোমরা জানতে চাইবে, এত তাড়া কিসের? ওড়ার শিক্ষায় সে পিছিয়ে আছে, তার বয়সে সাধারণত পায়রা উড়তে পারে; তারপর আষাঢ় মাসে বর্ষার সুরু, তখন তার পক্ষে অনেক দূর ওড়া সম্ভব হবে না। তাই যত শীঘ্র সম্ভব তাকে দিক চেনাবার চেষ্টা করছিলুম।

যাই হোক, জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হবার অনেক দিন আগেই তার বাপ ছেলের শিক্ষার ভার নিলে। সেদিন সারাদিন দক্ষিণা বাতাসে সহরের উপরকার আকাশ তপ্ত হতে পারেনি। বাতাস সেই সবে মাত্র থেমেছে। আকাশ স্বচ্ছ নির্মল — উজ্জল নীলকান্তমণির মত। চারিদিক এমন পরিষ্কার যে অনেক দূর পর্যন্ত সহরের গৃহচূড়া দেখা যাচ্ছে, আরো দূরে মাঠ বাগান শস্যক্ষেত নজরে পড়ছে। বেলা প্রায় তিনটার সময় চিত্রগ্রীব ছাতের পাকা পাঁচিলের উপর রোদ পোহাচ্ছিল। তার বাপ উড়ে বেড়াচ্ছিল, নেমে এসে ঠিক তার পাশে এসে বসলো। ছেলের পানে কেমন এক অদ্ভুত রকমে সে চাইলে, তার মানে যেন—"বলি কুঁড়ের সর্দার, বয়স ত প্রায় তিন মাস হল, এখনো ওড়বার সাহস হয় না! তুই কি বল্ দেখি—পায়রা না কেঁচো? কিন্তু গাম্ভীর্য্যের অবতার চিত্রগ্রীব কোনো জবাব দিলে না—স্থির হয়ে বসে রইলো। দেখে বাপের অসহ্য বোধ হল, সে পায়রার ভাষায় বক্-বক্-কুম্ করে ছেলেকে ভৎর্সনা

করতে লাগলো। বকুনি এড়াবার জন্য চিত্রগ্রীব যতই সরে বসে, বাপও ততই এগিয়ে যায় ডানার ঝাপট দিয়ে—বক্-বকানিও থামে না।

চিত্রগ্রীব কেবলি সরে সরে বসতে লাগলো, বুড়ো কিন্তু তাতে নিরস্ত হলনা, সে-ও তার সঙ্গে লেগে রইলো, বকুনির মাত্রাও বেড়ে গেল। ছেলেকে ঠেলতে ঠেলতে পাঁচিলের শেষ প্রান্তে এমন জায়গায় উপস্থিত করলে যে ছাতের উপর থেকে গড়িয়ে পড়া ছাড়া তার আর উপায় রইলো না। হঠাৎ বাপ ছেলের হালকা দেহের উপর নিজের দেহের সমস্ত ভার দিয়ে ঝুঁকে পড়লো। চিত্রগ্রীবের পা ফসকে গেল, আধফুট পড়তে না পড়তেই সে তার ডানা মেলে উড়তে সুরু করলে। সকলের পক্ষেই কী আনন্দের কথা! তার মা নীচে জলে ডুব দিয়ে বৈকালের প্রসাধন সম্পন্ন করছিল, ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে ছেলের সঙ্গে উড়তে সুরু করলে। ছাতের উপর অন্তত মিনিট দশেক চক্রাকারে উড়ে তারা নেমে এল। ছাতে পৌঁছে মা দস্তুরমাফিক ডানা গুটিয়ে স্থির হয়ে বসলো। কিন্তু চিত্রগ্রীবের কথা অন্য; ছোট ছেলে ঠাণ্ডা গভীর জলে গিয়ে পড়লে যেমন ভয় পায়, তারও তেমনি অবস্থা। তার সারা দেহ কাঁপছে, নেমে এসেও ছাতের উপর পা পাততে পারছে না, তাল সামলাবার জন্য ডানা ঝটপট করে সে পিছলে বেড়াতে লাগলো—পায়ে যেন চাকা বাঁধা আছে। শেষে দেওয়ালের একপাশে ধাক্কা খেয়ে সে থেমে গেল, আর অমনি চট্ করে তার ডানা মুড়ে ফেল্লে, যেমন করে আমরা পাখা বন্ধ করি। উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছে, তার মা এগিয়ে গিয়ে

তার গা ঘেঁসে দাঁড়ালো—সে যেন নিতান্ত শিশু, যাকে জড়িয়ে রাখা দরকার। কাজ ঠিকমত সম্পন্ন হয়েছে বুঝে চিত্রগ্রীবের বাপ তৃপ্ত মনে স্নান করতে নেমে গেল।



তিন

নতুন ডুবুরির মত, বাতাসে ঝাঁপ দেবার ভয় যখন ভেঙ্গে গেল, তখন চিত্রগ্রীবের ওড়ার বহরও বেড়ে চল্লো। হপ্তাখানেকের মধ্যে তার একটানা আধঘণ্টা পর্য্যন্ত ওড়বার শক্তি হল, বাড়ী ফিরে ছাতের উপর তখন সে বাপমায়ের মতনই অবলীলায় নামতে শিখলে, ছাতে পা ঠেকবার সময় তাল সামলাবার জন্য ভয়ে ডানার ঝটাপটি থেমে গেল।

প্রথম প্রথম ওড়বার সময় বাপ মা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো, এখন তাকে পিছনে ফেলে তারা আরো অনেক উপরে উড়ে যায়। কিছুদিন আমি ভাবতুম এমনি করে তারা তাকে আরো উঁচুতে ওড়বার চেষ্টা করছে, কারণ ছেলে সর্বদাই বাপমায়ের সমান উঁচুতে ওঠবার চেষ্টা করতো। তখন মনে হত হয়ত গুরুজনেরা শিশুর সামনে একটা মহৎ দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে। কিন্তু অবশেষে জ্যৈষ্ঠের শেষে একদিন আমার সে ধারণা নিম্নলিখিত বিষম ঘটনায় বিচলিত হল। চিত্রগ্রীব উঁচুতে উড়ছে; সে যত বড়, উঁচুতে ওঠার দরুণ তাকে তার অর্দ্ধেক দেখাচ্ছে। তার উপরে তার বাপ মা উড়ছিল—মানুষের মুঠির মত তাদের দেখতে হয়েছে। চক্রাকারে তারা ঘুরছিল—নাগরদোলার মত। তাদের সেই ঘোরা নিরর্থক একঘেয়ে মনে হল। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলুম; তা ছাড়া অনেকক্ষণ উপর পানে একটানা চেয়ে থাকা কষ্টকর। দিগন্তের পানে যখন চোখ নামলো, তখন দৃষ্টি আবদ্ধ হল একটি কালো দাগের

উপর—সেই দাগ দ্রুতগতি অগ্রসর হচ্ছে আর প্রতি মুহূর্ত্তে বড় হচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম এ কোন্ পাখী, যে এত দ্রুত সোজা উড়ে আসছে? কারণ সংস্কৃতে পাখীকে বলে তির্য্যঞ্চ, অর্থাৎ যার গতি বক্র, সোজা নয়।

কিন্তু এ আসছে সোজা তীরের মত। আর মিনিট দু'য়ের মধ্যে আমার সন্দেহ দূর হল। সে একটা বাজপাখী—চিত্রগ্রীবকে আক্রমণ করতে আসছে। চোখ তুলে এক অপূর্ব দৃশ্য দেখলুম। তার বাপ উলটে-পালটে ডিগবাজী খেয়ে খেয়ে অবিরাম নীচে নামছে ছেলের কাছে পৌছবার জন্য; তার মা-ও সেই উদ্দেশ্যে দ্রুত বক্রগমন সুরু করেছে। ভয়ঙ্কর বাজপাখীটা চিত্রগ্রীবের বিশ হাত তফাতে পৌছতে না পৌছতে তার বাপ-মা তার দুই পাশে স্থান নিলে। এই বার তিন জনে নীচে নামতে লাগলো—শত্রুর পথের সঙ্গে তাদের গতিপথে সমকোণ রচনা করে। পায়রাদের এই চালে কিন্তু বাজ দমলো না—সে ক্ষিপ্রবেগে আক্রমণ করলে। পায়রারা শূন্যে ডুব দেওয়াতে আক্রমণ ব্যর্থ হল—কিন্তু নিজের আক্রমণের বেগেই বাজ তাদের অনেকটা নীচে নেমে পড়লো। পায়রাগুলো চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নীচে নামতে লাগলো, আর এক মিনিটে তারা আমাদের ছাতের আধাপথে এসে পৌছলো। বাজের মতির পরিবর্ত্তন হল। উঁচু থেকে উঁচুতে ক্রমেই সে উপরে উঠতে লাগলো; এত উঁচুতে উঠলো যে পায়রারা আর তার ডানার পালকের মধ্যে বাতাসের সাঁই সাঁই শুনতে পায় না; আর সে তাদের উপরে থাকতে তাকে চোখেও দেখে না। নিরাপদ ভেবে তারা ঢিলা

দিলে। যত দ্রুত তারা উড়ছিল, দেখলুম তত জোরে আর উড়ছে না। সেই মুহূর্তে দেখতে পেলুম, তাদের উপরে অনেক উঁচুতে বাজপাখী তার ডানা গুটিয়ে নিচ্ছে ; তার পর সে পড়ো-পড়ো হল, পরমুহূর্তে সে তাদের উপরে এক টুকরো পাথরের মত ঝুপ করে এসে পড়লো। মরিয়া হয়ে আঙুলগুলো মুখের মধ্যে পুরে একটা তীক্ষ্ণ শিষ দিলুম—সতর্ক করবার সংকেত। পায়রাগুলো অমনি ডুব দিলে—তলোয়ার যেন শূন্য ভেদ করে পড়েছে! তবুও বাজপাখী তাদের পিছু পিছু চল্লো। একটু একটু করে প্রতি মুহূর্তে তাদের মধ্যেকার ব্যবধান কমে' আসছে। দ্রুত থেকে দ্রুততর সে নামছে—শেষে শিকার আর তার মধ্যে বড় জোর তের চৌদ্দ হাতের ব্যবধান। নিঃসন্দেহ চিত্রগ্রীবের প্রতিই তার লক্ষ্য। তার দুষমণ নখগুলো চোখে পড়লো, অসহ্য দুঃখে মনে হল—বোকা পায়রাগুলো প্রাণ বাঁচাবার জন্যে কি কিছুই করবে না? ও: সে এত কাছে এসে পড়েছে—ওরা যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে একবার…ঠিক সেই সময় তারা উঁচু দিকে উঠতে সুরু করলে—প্রকাণ্ড বৃত্ত রচনা করতে করতে। বাজপাখীও পিছু নিলে। তারপর তারা একটা দীর্ঘ ডিম্বাকার পথে উড়তে লাগলো। পাখী যদি বৃত্তাকারে ওড়ে, তবে হয় সেই বৃত্তের মাঝের দিকে নয় তা থেকে দূরে যাবারই তার ঝোঁক থাকে। বাজপাখী তাদের মতলব না বুঝে মাঝের দিকেই ঝুঁকলো—পায়রার বড় বড় বৃত্তের মাঝে একটা ছোট বৃত্ত রচনা করে। যেই সে তাদের পানে পিছন ফিরিয়েছে অমনি পায়রাগুলো আর এক ডুব মারলে—প্রায় ছাতের উপর পর্য্যন্ত—কিন্তু দুষমণ তাতে নিরস্ত হল না। চকিতে সে কালো বিদ্যুৎশিখার মত

ধাওয়া করে এল। শিকার এবার ছাত লক্ষ্য করে বক্রাকারে ডুব দিলে—অবশেষে তারা আমার বিস্তৃত বাহুর আশ্রয়ে নিরাপদ হল। ঠিক সেই মুহূর্তে শূন্যে বাতাস যেন চীৎকার করে উঠলো—আমার মাথার এক ফুট উঁচু দিয়ে বাজ পাখীটা হুস করে উড়ে গেল—তার চোখদুটো যেন জ্বলছে, আর নখগুলো লকলক করছে সাপের জিভের মত। শুনতে পেলুম বাতাস তখনো তার পালকের মাঝে গুমরে গুমরে উঠছে।

আমার পোষা পাখী এই ভাবে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেল। আমি তখন চিত্রগ্রীবকে দিক নির্ণয় শেখাতে সুরু করলুম। একদিন তিনটি পাখীকেই খাঁচায় ভরে সহরের পূর্বদিকে নিয়ে গিয়ে সকাল ঠিক ন'টার সময় তাদের ছেড়ে দিলুম। তারা নিরাপদে বাড়ি পৌঁছল। পরদিন পশ্চিম দিকে ঠিক ততটা দূরে তাদের নিয়ে গেলুম। হপ্তাখানেকের মধ্যে তারা যেদিক থেকে হোক প্রায় সাত আট ক্রোশ তফাৎ থেকে আমাদের বাড়ি আসবার পথ চিনে গেল।

জগতে কিছুই নির্বিঘ্নে সমাধা হয় না—চিত্রগ্রীবের শিক্ষাও শেষ পর্য্যন্ত একটা বাধা পেল। তাকে তার বাপ মা'য়ের সঙ্গে নৌকায় গঙ্গা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম। সকাল ছ'টায় যখন বার হই, তখন আকাশে ছেঁড়া মেঘ ছড়িয়ে ছিল, দক্ষিণ থেকে বাতাস বইছিল, ওরি মধ্যে একটু জোরে। আমাদের নৌকা বোঝাই চাল বরফের মত সাদা, তার উপর লাল আর সোনালি রঙের রাশি রাশি আম—সাদা পাহাড়ের চূড়ায় যেন সূর্য্যাস্তের আলো এসে পড়েছে!

আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল সে এমনি শান্ত দিনে হঠাৎ ভীষণ ঝড় ওঠা অসম্ভব নয়, কারণ বালক হলেও আষাঢ় মাসে বর্ষার খামখেয়ালির কথা আমার অজানা ছিল না।

ক্রোশ দশেক অতিক্রম করতে না করতে বর্ষার সজল নবীন মেঘ আকাশে ছুটাছুটি সুরু করে দিলে, বাতাসের বেগ এমন যে তার দ্বারা আমাদের নৌকার একখানা পাল ছিঁড়ে গেল। আর সময় নষ্ট করা অনুচিত ভেবে খাঁচা খুলে পায়রা তিনটিকে ছেড়ে দিলুম। বাতাসে ধাক্কা খেয়ে তারা ডিগবাজি খেয়ে গেল, খুব নীচু দিয়ে উড়তে সুরু করলে, প্রায় জলে পড়ে আর কি! এমনি করে জলের উপর খুব কাছ দিয়ে প্রায় মিনিট পনেরো তারা উড়ে চল্লো, প্রবল বাতাসের বিরুদ্ধে অতি সামান্যই অগ্রসর হতে পারলে। তবুও তারা নিরস্ত হল না, আর মিনিট দশেকের মধ্যেই দেখতে পেলুম তারা দিক পালটে তীরের পানে উড়ে চলেছে। আমাদের বামে গ্রামগুলোর কাছাকাছি যখন তারা পৌছলো প্রায় সেই সময় আকাশ মিশ কালো হয়ে উঠেছে, মেঘের স্রোতে স্রোতে সমস্তই ঢাকা পড়ে গেল, চোখে দেখতে লাগলুম কালির মত জল ছড়িয়ে আছে, আর তার মাঝ দিয়ে বিদ্যুৎ এঁকে বেঁকে মরণের তাণ্ডব সুরু করেছে। পায়রা-গুলোকে আবার ফিরে পাবার সমস্ত আশা ত্যাগ করলুম। আমরা নিজেরাই নৌকাডুবি হতে বেঁচে গেলুম—ভাগ্যক্রমে এক গ্রামের ধারে নৌকা তীরে গিয়ে লাগলো। পরদিন সকালে ট্রেনে বাড়ি গিয়ে দেখি তিনটির বদলে দুটি ভিজা পায়রা। চিত্রগ্রীবের বাবা ঝড়ে মারা গেছে। আমারি দোষে এমন হল সন্দেহ নাই! পরের

কয়েক দিন আমাদের পরিবার শোকমগ্ন হয়ে রইলো। বৃষ্টি একটু ধরলেই পায়রাদুটিকে নিয়ে রোজ ছাতে উঠতুম, আকাশে দৃষ্টি মেলে চিত্রগ্রীবের হারানো বাপের সন্ধান করতুম। কিন্তু হায়, সে আর ফিরে এল না!



চার

সমতলের গ্রীষ্মও যেমন, বর্ষাও তেমনি—দুই অসহ্য; তাই আমাদের পরিবার হিমালয়ে যাওয়া স্থির করলে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে দেখবে উত্তর-পূর্ব কোণে এক সহর, তার নাম দার্জিলিং। পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ হল এভারেষ্ট—দার্জিলিং সহরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দার্জিলিং থেকে কয়েক দিনের পথ পথিকদলের সঙ্গে ধীরে ধীরে পার হয়ে পায়রাদুটি নিয়ে আমরা এক ছোট গ্রামে গিয়ে পৌছলুম। গ্রামটির নাম দেন্তাম—জায়গাটি সমুদ্র থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু।

পাথরে আর কাদায় তৈরী বাড়ি, নীচেকার ছোট ছোট উপত্যকায় চা'য়ের ক্ষেত। তারও পরে শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়ের কঠিন বঙ্কিম মহিমা—পাহাড়ের মাঝে মাঝে উপত্যকা, সেগুলি ধানের ক্ষেতে, ভুট্টাক্ষেতে আর ফলের বাগানে পূর্ণ। আরো দূরে অস্পষ্ট চিরশ্যামল পাহাড়ের খাড়াই, তার উপর সগর্বে মাথা তুলে আছে হাজার হাজার ফুট উঁচু সাদা ধবধবে পর্বতশ্রেণী—কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাকালু আর এভারেষ্ট। ভোরের প্রথম আলোয় তারা সাদা দেখায়; তার পর সূর্য যত উপরে ওঠে, আলোর উজ্জ্বলতা যতই বাড়ে, ততই চূড়ার পর চূড়ার রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। মনে হয় তারা যেন বেশি দূরে নাই, আকাশের ঠিক মাঝখানটা ফুঁড়ে যেন তারা উঠেছে—সেখান থেকে লাল টকটকে আলোর ধারা নেমে আসছে বন্যাস্রোতের মত।

ভোরবেলা হিমালয় সব চেয়ে ভালো দেখায়, কারণ দিনের অন্য অন্য সময় পাহাড় মেঘে ঢাকা থাকে। শ্রাবণ মাসে রোজ প্রত্যূষে

এভারেষ্ট দেখা যায় না, কারণ তখন বর্ষাকাল, চারিদিকে দুর্যোগ। ঝড় ও তুষারের বাধা কাটিয়ে কালেভদ্রে পর্বতচূড়া দেখা দেয়—কঠিন বরফ ও জমাট সাদা আগুনের স্তূপ। সূর্যের আলোয় তারা জ্বলতে থাকে, ওদিকে তাদের পায়ের তলায় মেঘের মত তুষার ঘুরে ঘুরে পড়ছে—যেন পাগল দরবেশের দল তাদের ভয়ঙ্কর দেবতার সামনে বাঁধনহারা নাচ স্বরু করে দিয়েছে।

গ্রীষ্মকালে আমার বন্ধু রাজা আর আমাদের জঙ্গুলে বিদ্যার গুরু বুড়ো ঘণ্ডুয়া আমাদের বাড়ী এসে পৌছলো। রাজার বয়স মাত্র ষোলো, কিন্তু তখনি সে পূজারি বামুন হয়ে দাঁড়িয়েছে; আর ঘণ্ডুয়াকে আমরা বরাবরই বুড়ো বলি, কারণ তার বয়স যে কত, কেউ জানে না। রাজাকে আর আমাকে জঙ্গল আর জীবজন্তুর রহস্য বোঝবার ভার সেই ঝানু শিকারির হাতে দেওয়া হয়েছিল।

দেনতামে গুছিয়ে বসবার পরই আবার আমার পায়রাগুলোকে দিক চেনাতে স্বরু করলুম। দিন পরিষ্কার থাকলেই আমরা সারা সকাল উঁচু চূড়াগুলোর দিকে উঠে যাই—চারিদিকে চিরশ্যাম গাছপালা আর রজন-গাছের স্থগন্ধি বন। তারপর হয় কোনো মঠের ছাত থেকে নয় কোনো ওমরাহের বাড়ী থেকে পাখীগুলোকে ছেড়ে দিই। সন্ধ্যার দিকে বাড়ী ফিরে দেখতুম চিত্রগ্রীব আর তার মা ঠিক আমাদের আগে এসে পৌছেচে। সারা শ্রাবণ মাসে ছ'টা পরিষ্কার দিন ছিল কি না সন্দেহ, তবুও প্রায় সর্বজ্ঞ ঘণ্ডালুর সাহায্যে বন্ধু রাজাকে নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে অনেকদূর বেড়িয়ে নিলুম। পাহাড়ীরা দেখতে অনেকটা চীনাদের মত; ওই জাতের সব রকম লোকের সঙ্গে বাস

করলুম, সকলের কাছেই গেলুম। ভারি সুন্দর তাদের ব্যবহার, আতিথেয়তাও উদার। অবশ্য পায়রাগুলো আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো—কখনো খাঁচায়, কিন্তু অধিকাংশ সময় আমাদের গায়ের কাপড়ের তলায়। আমরা প্রায়ই বৃষ্টিতে ভিজে গেলেও চিত্রগ্রীব আর তার মাকে ঝড়ঝাপ্‌টা থেকে রক্ষা করতুম।

শ্রাবণের শেষে আমরা সিকিম দেশের সমস্ত মঠ আর সমস্ত ওমরাহের প্রাসাদ পেরিয়ে বহু দূর চলে গেলুম, ততদূর আমরা তিনটি মানুষ বা আমাদের দুটি পায়রা কখনো দেখিও নি, জানিও নি। সিঙ্গলেল্ পেরিয়ে গেলুম, সেখানে খাসা একটি ছোট মঠ; তারপর অগ্রসর হতে লাগলুম ফালুতের দিকে—অজানা দেশে। অবশেষে ঈগল পাখীর দেশে গিয়ে পৌঁছলুম। চারিধারে ফাঁকা শিলাময় উঁচু পাহাড়, তাদের ঘিরে আছে 'ফার্' আর বেঁটে খাটো দেবদারু, আমাদের সামনে উত্তরে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর এভারেষ্ট পর্বতশ্রেণী। সেখানে এক অতলস্পর্শ খাদের ধারে দাঁড়িয়ে পায়রাদুটিকে ছেড়ে দিলুম। ছুটি হলে ইস্কুলের ছেলেরা যেমন আনন্দে ছুটে বার হয়, তারাও তেমনি করে সেই চনচনে বাতাসে উড়তে লাগলো। মা-পাখী অনেক উঁচুতে উঠে গেল ছেলেকে পর্বতের মহিমা দেখাবার জন্য।

পাখী দুটী উড়ে যাবার পর আমরা তিন জনে আলোচনা করতে লাগলুম—উঁচুতে উঠতে উঠতে তারা কি দেখছে। তাদের সমুখে অবশ্য কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিপুঞ্জের চূড়াদুটি—এভারেষ্ট শৃঙ্গের চেয়ে কিছু নীচু—কিন্তু সেই নিষ্কলঙ্ক গিরি যার উপর মানুষের পায়ের চিহ্ন

কখনো পড়েনি—তারি মত কঠিন ও পবিত্র। এই চিন্তায় আমাদের মনে কত গভীর ভাবের উদ্রেক হল। ক্ষণকালের জন্ম দূরবর্তী পর্বতকে দেখলুম যেন ভগবানের মুখের সামনে আয়নার মত—মনে মনে বল্লুম, পবিত্রতার শিখর তুমি—তুমি অনন্ত, তোমাকে লঙ্ঘন করতে কেউ পারেনি, কেহ যেন তোমাকে কলঙ্কিত না করে! তোমার নির্মল শুভ্রতাকে মানুষ যেন তার স্পর্শ মাত্র দিয়ে মলিন না করে! জগতের তুমি মেরুদণ্ড, অমরত্বের তুমি মাপকাঠি—চিরদিন তুমি অপরাজেয় হয়েই থাকো!

কিন্তু তোমাদের এত উঁচুতে এনেছি পাহাড়-পর্বতের কথা শোনবার জন্ম নয়—আমাদের এক 'অ্যাডভেঞ্চার' ঘটেছিল—তারি কথা বলতে। চিত্রগ্রীব তার মার সঙ্গে উড়ে যাবার পর তাদের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে পাশের এক চূড়ার উপর ঈগলের বাসার সন্ধানে যাত্রা করলুম। হিমালয়ের ঈগলের রং বাদামী, তার মাঝে একটু সোনালী আভা, দেখতে ভারি সুন্দর—তার মধ্যে শক্তি ও সৌন্দর্যের নিখুঁত সমন্বয়—তবুও সে একটি ভয়ঙ্কর হিংস্র জীব।

কিন্তু সেদিন বিকালে গোড়ায় ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পেলুম না, বরং তার বিপরীত। ঈগলের বাসায় নরম-রেঁায়ায়-ঢাকা দুটি সাদা ঈগল-ছানা আবিষ্কার করলুম। নবজাত শিশুদের মত তাদেরও দেখতে বড় ভালো লাগে। দখিনা বাতাস ঠিক তাদের চোখের মধ্যে বইছে, কিন্তু তাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। হিমালয়ের ঈগলের অভ্যাস বাতাসের পানে দোর রেখে বাসা তৈরী করা। কেন যে, কেউ জানে না। সম্ভবত, ঐ পাখী যার উপর ওড়ে, তারি মুখোমুখি থাকতে চায়।

ছানাগুলোর বয়স প্রায় তিন সপ্তাহ, কারণ, জন্মকালে তাদের যে তুলার মত চেহারা থাকে, তা ঘুচে গিয়ে পালক গজাতে সুরু হয়েছে। বয়সের তুলনায় তাদের নখ রীতিমত ধারালো আর ঠোঁট কঠিন ও তীক্ষ্ন।

ঈগলের বাসা বেশ বড় খোলা মেলা। বাসার সামনে, যেখানে সে নামে, সেখানটা চত্বরের মত—ছ' সাত ফুট চওড়া আর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু বাসার ভিতরটা অন্ধকার ঘিঞ্জি; সেখানে গাছের সরু মোটা ডালের ছড়াছড়ি, আর শিকারের কিছু কিছু চুল আর পালক—অন্যান্য অংশ ছানারা খেয়েছে। বাপ-মা মাংসের সঙ্গে চুল পালক আর হাড়ের অধিকাংশ সাবাড় করে।

আশ পাশে কেবল বেঁটেখাটো দেবদারু গাছ—সেগুলি পাখীর কলরবে পূর্ণ। 'ফার' গাছের মধ্যে নানা অজানা পতঙ্গের গুঞ্জন। ভুঁইচাপার উপর বেগুনির স্পর্শ—তার উপর কত মণিময় পতঙ্গ উড়ছে নীল পাখায় ভর দিয়ে; আর অতিকায় 'রডডেনড্রন্'—কোনটা বা চাঁদের মত বড়—ইতস্তত জলজল করছে। মাঝে মাঝে বনবেড়ালের ডাক—সম্ভবত, দিনদুপুরে ঘুমের ঘোরে সে ডাকছে।

হঠাৎ ঘণ্ডালু পাশের এক ঝোপের মধ্যে তাড়াতাড়ি গা ঢাকা দিতে বল্লে। আমরা যেই লুকোলুম অমনি চারিদিকের শব্দ কমে আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে পতঙ্গের গুঞ্জন থেমে গেল, পাখীরা আর কলরব করে না, গাছগুলোও যেন কিসের প্রত্যাশায় স্তব্ধ হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে বাতাসে যেন একটা ক্ষীণ শিষের শব্দ উঠলো, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে শব্দ গাঢ়তর হল, তারপরেই

একটা অমানুষিক শব্দ প্রায় একটা চিৎকারেরই মত, আর অমনি একটা অতিকায় পাখী ঈগলের বাসার দিকে ঝুঁকলো। তার ডানার মধ্যে বাতাসের সাঁইসাঁই তখনো থামেনি, তার আকার দেখে ঘণ্ডালু অনুমান করলে সে-ই বাচ্ছা দুটোর মা। ছানারা বাসার অন্দরে না ঢোকা পর্যন্ত সে বাতাসে স্থির হয়ে রইলো। তার নখ থেকে বড়ো খরগোসের মত ছাল ছাড়ানো কি একটা পদার্থ ঝুলছে। এইবার সে নামলো, শিকার চত্বরের উপর ফেল্লে। তার খোলা ডানার এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত হাত চারেক হবে। মানুষ যেমন করে কাগজ মোড়ে তেমনি করে সে ডানা মুড়ে ফেল্লে, তারপর বাচ্ছারা তার পানে আসছে দেখে সে নখগুলো গুটিয়ে নিলে, পাছে তাদের নরম অনাবৃত দেহে তা ফুটে যায়। এইবার সে ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলো। বাচ্ছা দুটো ছুটে গিয়ে তার আধখোলা ডানার মধ্যে অদৃশ্য হল, কিন্তু তারা আদর চায় না, তাদের ক্ষিদে পেয়েছে। তাই সে তাদের বাইরে নিয়ে এল সেই মরা খরগোসের কাছে, ঠোঁট দিয়ে কিছু মাংস ছিঁড়ে নিলে, তা থেকে হাড়গোড় বেছে ফেল্লে, তারপর তাদের খেতে দিলে। নীচে থেকে, চারিদিক থেকে পতঙ্গ ও পাখীর কলরব আবার সুরু হল। ঝোপের ভিতর থেকে উঠে বাড়ীমুখো রওনা হলুম। রাজা ও আমি ঘণ্ডালুকে স্বীকার করিয়ে নিলুম, ঈগলছানা বড় হয়ে উঠলে আমাদের এখানে এনে দেখাবে।

তাই মাসখানেকের কিছু পরে আবার আমরা সেখানে ফিরে গেলুম। চিত্রগ্রীব আর তার মাকেও সঙ্গে নিলুম, কারণ বাচ্ছাটাকে

দ্বিতীয়বার ওড়াবার ইচ্ছা, যাতে সে নির্ভুলভাবে প্রত্যেক গ্রাম, মঠ, হ্রদ, নদী জীবজন্তু প্রভৃতির পরিচয় পায়। আর অন্য পাখীদেরও চিনতে শেখে ; যেমন—সারস, তোতা, হিমালয়ের কঙ্ক, বুনোহাঁস, ডুবরী পাখী, ছোট ছোট লম্বা ঠেঙো শিকরে। এবার আমার, ঈগলের বাসা পেরিয়ে আরো প্রায় একশো গজ চলে গেলুম। শরতের আঙুল 'রডডেনড্রন্'কে ছুঁয়ে গেছে, তার আগুনের শিখার মত পাপড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ছে, কয়েক হাত উঁচু লম্বা ডাটাগুলো বাতাসে খড়মড় করছে। অনেক গাছের পাতা-ঝরতে সুরু হয়েছে, চারিদিকে একটা বিষণ্ণ বিমর্ষ ভাব। প্রায় এগারোটার সময় পায়রাগুলোকে খাঁচা খুলে ছেড়ে দিলুম। নীলকান্ত মণির মত আকাশ সাদা পর্বতচূড়া থেকে নৌকার পালের মত ঝুলছে—তারি মাঝে তারা উড়ে গেল।

আধ ঘণ্টা আন্দাজ উড়েছে, এমন সময় তাদের উপরে এক বাজ পাখীর আবির্ভাব। পায়রাগুলোর কাছাকাছি এসে সে তাদের পানে তেড়ে গেল। শিকার কিন্তু খুব সতর্ক ছিল, তারা নিরাপদে আক্রমণ এড়িয়ে নিলে। গাছগুলোর দিকে যেই তারা তাড়াতাড়ি নামছে অমনি বাজপাখীর বউ এসে তাদের আক্রমণ করলে। তার স্বামীর মত সে-ও তাদের পানে তেড়ে গেল, কিন্তু শিকার ধরতে পারলে না। শিকার পালায় দেখে পুরুষ-বাজ তার বউকে তীব্রস্বরে ডাকলে। ডাক শুনে সে শূন্যে থেমে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলো। পায়রাগুলো ভাবলে, আর ভয় নেই, তারা ডানার বেগ বাড়িয়ে দিয়ে দক্ষিণমুখো উড়ে চল্লো। অমনি বাজদুটো তাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হল, পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে শিকার লক্ষ্য করে। ডানার

ঘা'য়ে ঘায়ে তারা পায়রাগুলোর কাছে এগিয়ে আসছে। কসাইয়ের মুড়োভাঙ্গা বাঁকা ছোরার মত ডানা ঝড়ের বেগে শূন্য কাটতে লাগলো...এক, দুই, তিন—বর্ষার মত সন্ করে গিয়ে তারা পড়লো। চিত্রগ্রীবের মা থেমে গেল, স্থির হয়ে বাতাসে কেবল ভেসে রইলো। ফলে বাজপাখীদের মতলব গেল ফেঁসে। এখন উপায়? কোনটাকে ধরা যায়? এই সব চিন্তায় সময় যায়, সুযোগ বুঝে চিত্রগ্রীব পথ বদলে ফেল্লে। দ্রুতগতি সে উপরে উঠতে লাগলো, অচিরে তার মা-ও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে—কিন্তু তার দেরী হয়ে গিয়েছিল, বাজপাখীদুটো প্রায় ডিগবাজী খেয়ে তার কাছে গিয়ে হাজির হল। হঠাৎ সে আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়লো—সে ভাবলে বাজেরা তার ছেলেকে ধরতে যাচ্ছে; তাই কিছুমাত্র দরকার না থাকলেও, চিত্রগ্রীবকে রক্ষা করবার জন্য সে শত্রুর দিকে উড়ে চল্লো। দেখতে দেখতে শিকারী পাখীদুটো তার ঘাড়ে এসে পড়লে। শূন্যে ঝরঝর করে পালকের ধারা ঝরে গেল! চিত্রগ্রীব ভয়ে বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য কাছাকাছি একটা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পড়লো। মা'য়ের ভুলে তার প্রাণ গেল, সম্ভবত ছেলেরও প্রাণসঙ্কট ঘটলো।

চিত্রগ্রীব যেখানে পড়েছিল, আমরা তিন জনে সেই চূড়ার সন্ধান শুরু করলুম। কাজ সহজ নয়, হিমালয়ে পদে পদে বিপদ। বাঘের না হলেও অজগরের ভয় আছে। কিন্তু বন্ধু রাজা পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, শিকারী ঘণ্ডালুও তার সঙ্গে একমত। সে বল্লে, সন্ধান করা ভালো, তার দ্বারা আমাদের জ্ঞানের মাত্রা বাড়বে।

আমরা চূড়া থেকে নেমে এলুম, তারপর একটা গিরিসঙ্কটে ঢুকে দেখি কাঁচা হাড় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। আগের রাতে কোনো হিংস্র জন্তু সেখানে তার শিকার ভক্ষণ করেছে, বেশ বোঝা গেল। কিন্তু আমাদের ভয় হলনা, কারণ নায়ক আমাদের ঘণ্ডালু, যার তুল্য দক্ষ শিকারি বাংলা দেশে আর নাই। কিছুক্ষণের মধ্যেই কষ্টকর চড়াই সুরু হল সরু সরু গলি ঘুঁজি বেয়ে বেয়ে। সবুজ শেওলার উপর বেগুনি আগাছার ছড়াছড়ি, চারিদিকে 'ফার্' আর গন্ধগাছে সুগন্ধ। মাঝে মাঝে 'রডডেন্‌ড্রেন্' ফুটে রয়েছে। বাতাস ঠাণ্ডা, চড়াইয়ের যেন আর শেষ নাই। এক এক মুঠো ভিজা ছোলা চিবিয়ে বেলা দুটার পর, চিত্রগ্রীব যেখানে লুকিয়ে ছিল, সেই চূড়ায় গিয়ে পৌছলুম। অবাক হয়ে দেখি এ সেই ঈগলের বাসা, যেখানে ইতিপূর্ব্বে দুটো ঈগলছানা দেখেছিলুম। ছানাদুটো বেশ ডাগর হয়েছে— বাসার সামনের চত্বরে তারা বসে আছে। তারপর দেখি কি, পাশের এক চত্বরে দূরের এক কোণে, গুঁড়ি সুঁড়ি মেরে বসে আছে আমাদের চিত্রগ্রীব একান্ত নিস্তেজ ভাবে। আমাদের দেখে ঈগল-ছানারা ঠোঁট দিয়ে আক্রমণের উদ্‌যোগ করলে। রাজার হাত ছিল সবচেয়ে কাছে—ভয়ানক এক ঠোকরে তার বুড়ো আঙুলের চামড়া চিরে ঝরঝর করে রক্ত বার হতে লাগলো। চিত্রগ্রীব আর আমাদের মাঝে রয়েছে ঈগলেরা, অপর একটা উঁচু চূড়ায় উঠে তার কাছে পৌছানো ছাড়া আর উপায় নাই। হাত দশ বারো যেতে না যেতই ঘণ্ডালু লুকোবার জন্য ইসারা করলে, যেমন সে প্রথমবার এখানে আসার সময় করেছিল। তাড়াতাড়ি এক দেবদারু গাছের তলায়

গিয়ে লুকোলুম। দেখতে দেখতে বাতাসে মৃদু শব্দ তুলে একটা ধাড়ি ঈগল কাছে এসে পৌঁছলো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঈগল সশব্দে উড়ে বাসার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। তার লেজের পালক আমাদের গাছের উপর ঘসে গেল—সেই শব্দে আমার সারা অঙ্গ অপূর্ব আনন্দে শিউরে উঠলো।

লোকের ধারণা ঈগল দুরারোহ নির্জন পাহাড়ের মাথায় বাসা তৈরি করে; এ ধারণা ভুল। সকল পাখী বা পশুর বাসা বাঁধাবার জন্য এত সাবধান হবার প্রয়োজন হয় না। এমন এক প্রকাণ্ড পাখীর প্রথম দরকার জায়গা; যাতে সে তার বাসার বাহিরের উঠানে তার ডানা মেলতে আর বন্ধ করিতে পারে; এত বড় জায়গা ত আর মানুষের অগম্য হতে পারে না। তারপর বাসা তৈরীর কাজে ঈগল পটু নয়। পর্বতচূড়ায় পাহাড়ের মাথায় কোন গহ্বর থেকে বার হয়েছে এমন একটি শিলাময় চত্বর সে বেছে নেয়—সেখানে বাসা তৈরী কাজের তিন ভাগের দু'ভাগ প্রকৃতিই শেষ করে রেখেছে, অবশিষ্ট এক ভাগ কাজ কেবল পাখীরা করে; তা হচ্ছে গাছের ডাল পাতা ঘাস প্রভৃতি জড়ো করে একটি অপরিষ্কার শয্যা তৈরী করা যার উপর ডিম পাড়া ও ফোটানো চলে।

আমরা যেখানে লুকিয়ে ছিলুম সেখান থেকে গুড়িগুড়ি বার হয়ে, দূর থেকে ঈগলের বাসা দ্বিতীয়বার লক্ষ করে এই সব খুঁটি নাটি খবর আমরা সংগ্রহ করলুম। এরা যে আমাদের পুরানো বন্ধু তাতে আর সন্দেহ নাই—সেই বাচ্ছাদুটো এখন বড়ো হয়েছে, ধাড়ী পাখীটা তাদের মা। মা এখনো অভ্যাসবসে তার নখ গুটিয়ে নেয়,

পাছে বাচ্ছাদের গায়ে আঁচড় লাগে। কিন্তু এ কেবল মুহূর্তের জন্য, যখন সে নিশ্চিত বুঝতে পারে বাচ্ছারা তার কাছেই ছুটে আসছে, তখন সে নখ খুলে বাহিরের চত্বরে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। বাচ্ছারা, যদিও এখন তাদের আর বাচ্ছা বলা মানায় না, কারণ তারা বেশ সেয়ানা হয়েছে, ছুটে এসে মায়ের ছড়ানো পাখার তলে আশ্রয় নেয়। কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না। তারা ত আদর চায় না, তারা চায় খেতে, তাদের বিষম ক্ষিদে পেয়েছে, অথচ মা কিছুই আনে নি, তাই বুঝে মাকে ছেড়ে তারা ঘুরে বসলো বাতাস পানে মুখ করে। তারা অপেক্ষা করতে লাগলো।

ঘণ্ডালুর ইসারায় আমরা তিন জনে আবার পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। আর এক ঘণ্টার মধ্যে ঈগলের বাসার ছাতের উপর দিয়ে গিরগিটির মত চুপে চুপে আমরা পার হয়ে গেলুম। ঠিক সেই সময় হাড় আর শুকনো মাংসের বিকট দুর্গন্ধ নাকে এসে ঢুকলো। এতে প্রমাণ হল যে ঈগল পাখীর রাজা হলেও পায়রার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। ঈগলের বাসার চেয়ে পায়রার বাসাই আমার পছন্দ।

ক্রমে চিত্রগ্রীবের কাছে পৌঁছে তাকে তার খাঁচার মধ্যে পোরবার চেষ্টা করলাম। আমাদের দেখে খুসি হলেও খাঁচায় ঢোকায় তার আপত্তি। বেলা পড়ে আসছে দেখে তাকে কিছু ধান খেতে দিলাম। ধান যখন প্রায় অর্দ্ধেক শেষ হয়েছে, তখন তাকে খাওয়ায় ব্যস্ত দেখে খপ্ করে' হাত দিয়ে ধরতে গেলাম। ভয় পেয়ে বেচারা উড়ে গেল। ওড়ার শব্দে মা-ঈগল বাসার ভিতর থেকে বার হয়ে এলো। বাহিরে চোখ মেলে যখন সে চাইলে তখন তার ঠোঁট কাঁপছে, ওড়বার জন্য

ডানা প্রায় খুলে আসছে। নীচে জঙ্গলের সমস্ত শব্দ অমনি থেমে গেল—ঈগল উড়লো। আমাদের মনে হল এবার চিত্রগ্রীবের সব শেষ। হঠাৎ একটা ছায়া তার উপর এসে পড়লো, ভাবলাম ঈগল বুঝি ছোঁ মারছে; ছায়া কিন্তু তখনি সরে গেল। পায়রাটা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে উড়েই চল্লো—আঁকাবাঁকা পথে আমাদের দৃষ্টির বাইরে সে চলে গেল।

আমার স্থির বিশ্বাস চিত্রগ্রীবকে আর পাওয়া যাবে না। ঘণ্ডালু কিন্তু বোঝাতে লাগলো দু'এক দিনের মধ্যেই তাকে পাওয়া যাবে, তাই আমরা সেখানে থেকে অপেক্ষা করাই স্থির করলুম।

রাত হয়ে এল, আমারা দেওদার-পুঞ্জের তলার আশ্রয় নিলুম। পরদিন সকালে ঘণ্ডালু বল্লে, বাচ্ছা ঈগলগুলো আজ উড়বে। সে বল্লে, ঈগলেরা বাচ্ছাদের কখনো উড়তে সেখায় না, বাচ্ছাদের ওড়বার সময় এলে তারা বুঝতে পারে। তখন বাপ-মা চিরদিনের জন্য তাদের ত্যাগ করে চলে যায়।

সারাদিনে ধাড়ি ঈগল আর বাসায় ফিরলো না। আবার যখন রাত হয়ে এল তখন বাচ্ছারা তার ফেরার আশা ছেড়ে বাসার ভিতর গিয়ে ঢুকলো। আমাদের পক্ষে সে এক স্মরণীয় রাত্রি। আমরা এত উঁচুতে আছি যে কোনো চতুষ্পদ হিংস্র জন্তুর আক্রমণের ভয় মোটেই নাই। বাঘ আর চিতার নীচু পানেই গতি। তারা যে উঁচুতে উঠতে ভয় পায় তা নয়; সমস্ত জন্তুর মতই তারাও আহারের অনুসরণ করে। কৃষ্ণসার, হরিণ, বাইসন্ বা বন্য বৃষ, বুনো শুওর

চরে উপত্যকায় আর যেখানে জংলি গাছপাতা প্রচুর। নদীর ধারে যেখানে ঘাস, চারাগাছ, সরস সুমিষ্ট গাছের ডাল জন্মায়, সে-সব জিনিষের খাদকেরা সেখানেই তাদের সন্ধান করে। তাই, পাখী আর কয়েক রকম জন্তু—যেমন বন বেড়াল, অজগর আর বরফের চিতা—ছাড়া পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় কোনো হিংস্র জন্তু থাকে না। এমন কি চমরীও সর্বদা বা অনেকে এত উঁচুতে ওঠে না। কখনো কখনো দু' একটা পাহাড়ী ছাগল দেখা যায় বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কিছু নয়, তাই রাত্রে বিশেষ কিছু ঘটেনি। কিন্তু ভোর রাতে হাড়ভাঙ্গা শীতে সারা দেহ যখন ঠকঠক করে কাঁপতে থাকতো তখন ঘটনার অভাবের কথা আর মনে থাকৃত না। ঘুম অসম্ভব, তাই উঠে বসে গায়ে সব কখানা কম্বল জড়িয়ে চোখ কান খুলে রাখতুম। সুগভীর স্তব্ধতা—যেন ডমরুর চামড়া এমন টান করে বাঁধা যে তার উপর নিশ্বাস ফেল্লেও আওয়াজ বার হয়। চারিদিক থেকে স্তব্ধতা আমাকে ঘিরে ধরে যেন বিঁধতে লাগলো। মাঝে মাঝে শরতের শুকনো পাতার উপর অদূরবর্তী গাছের ডাল থেকে কোমল পায়ে বনবেড়াল লাফিয়ে পড়ে—তারই শব্দ কানে বাজে বোমা ফাটার শব্দের মত। স্তব্ধতার জোয়ার অবিরাম উঠছে—তারি মাঝে সে শব্দ অচিরে ডুবে যায় এক টুকরো পাথরের মত। আস্তে আস্তে একটি একটি করে তারা আস্তে নামে। চারিদিকের রহস্য আরো ঘনিয়ে ওঠে, এমন সময় ঈগলের বাসায় কি যেন কেঁপে উঠলো বর্ষা নাড়ানোর মত। প্রভাত আসছে তাতে সন্দেহ নাই। আবার সেই স্থান থেকে সেই একই রকম শব্দ উঠলো, সম্পূর্ণ ঘুম-

ভাঙ্গার আগে মানুষ যেমন করে হাত পা মেলে আড়ামোড়া দেয় ঈগলেরা তেমনি করে ডানা ছাড়াচ্ছিল। তারপর নিকটে একটা সরসর শব্দ কানে এল—মনে হল ঈগল দুটো তাদের বাসার সমুখের চত্বরে এগিয়ে আসছে। শীঘ্রই অন্যান্য শব্দও শুনতে পেলুম। উপরে সারসেরা উড়ে চল্লো—দীর্ঘগ্রীব অজানা পাখী শূন্যে দেখা দিল। নিকটে কোথায় চমরীর হাম্বারব স্তব্ধতা ছিঁড়ে ফেল্লে—ডমরুর চামড়ার মধ্যে যেন সে শিং চালিয়ে দিয়েছে। অনেক নীচে পাখীরা পরস্পরে ডাকাডাকি করতে লাগলো। অবশেষে কাঞ্চনজঙ্ঘা গিরিশ্রেণীর উপর একটা সাদা আলো এসে পড়লো। তারপর মাকালু গিরি দেখা দিল মাথার পিছনে গোদন্ত-মণির মত—এক বিরাট আভামণ্ডল। নীচের গিরিশ্রেণী দুধের মত সাদা চাদরে দেহ আবৃত করলে, পাষাণ এবং গাছের আকার ও রং ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগলো। সকালের শিশিরে আগাছাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। এবার সূর্য, সিংহের মত আকাশের কাঁধে লাফিয়ে উঠলো, আর বরফের প্রাচীর-ঘেরা দিগন্তের গা' দিয়ে লাল আগুন ঝরতে লাগলো রক্তের মত।

ঘণ্ডালু আর রাজার ঘুম ইতিপূর্বেই ভেঙ্গেছিল, তারা দাঁড়িয়ে উঠলো। রাজা পূজারি ব্রাহ্মণ—আগেই বলেছি। নূতন সূর্যের পানে মুখ ফিরিয়ে সে সূর্যের যে স্তব সুরু করলে, তার বাংলা এই :—

ধেয়াই বরেণ্য সবিতায়
রমণীয় দীপ্তি-দেবতায়
আমাদের বুদ্ধি-বিধাতায় ॥*

---

* সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ

মানুষের গলার আওয়াজ অজানা, তা শুনে ছোট ঈগলদুটো ভয় পেলে, কিন্তু তারা ক্ষেপে ওঠবার আগেই স্তব শেষ হয়ে গেল, আমরাও সেই বেঁটে দেওদারের তলায় গা-ঢাকা দিলুম। ঈগল দুটোর সকালের খাওয়া হয়নি, তারা চোখ মেলে আকাশে বাপ-মায়ের সন্ধান করতে লাগলো। তার পর তাদের দৃষ্টি ফিরলো নীচুপানে, যেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে তোতা আর নীলকণ্ঠ উড়ছে— উপর থেকে তাদের humming birdএর মত ছোট দেখাচ্ছে। দক্ষিণ মুখো যাত্রায় বুনো হাঁসের দল বরফে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করে সারবন্দি উড়ে আসছে। অবিলম্বে তারাও পতঙ্গের মত হয়ে শূন্যে অদৃশ্য হল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, তবুও ধাড়ি ঈগলের দেখা নাই! ছোট ঈগলগুলোর ক্ষিদে বেড় চলেছে, বাসায় বসে বসে তাদের মেজাজও বিগড়ে গেল। শুনতে পেলুম বাসার ভিতরে একটা ঝগড়া চলেছে, ক্রমেই সেটা বাড়াতে লাগলো, গোলমালও বেড়ে চল্লো। শেষে তাদের মধ্যে একজন বিরক্ত হয়ে বাসা ছেড়ে পাহাড়ের চূড়া বেয়ে উঠতে লাগলো। ক্রমেই সে উপরে উঠছে পায়ে হেঁটে হেঁটে। দুপুর উতরে গেল, আমাদের খাওয়া চুকলো, তবুও ধাড়ি পাখীদের দেখা নাই। যে ঈগলটি বাসায় রইলো, মনে হল সে বোন, কারণ অপরটির চেয়ে সে আকারে ছোট, বাতাসের দিকে ফিরে দূরে দৃষ্টি মেলে সে বসে আছে, কিন্তু বুঝতে পারছি সে-ও হতাশ হয়ে পড়ছে। শুনতে আশ্চর্য, কিন্তু এমন কোনো হিমালয়ের ঈগল এখনো চোখে পড়েনি যে জন্মাবধি উড়তে শেখা পর্যন্ত বাতাসপানে মুখ করে না বসে। নাবিকের

ছেলেও হয়ত এমনি করে সমুদ্রের পানে ফিরে বসে, যতদিন না সে সমুদ্রে পাড়ি জমায়। বিকাল প্রায় দুটার সময় বোন ঈগলও বাসায় বসে বসে শ্রান্ত হয়ে উঠলো। ভায়ের সন্ধানে সে যাত্রা করলে। সে অনেক উঁচুতে এক পাহাড়ের মাথায় বসে ছিল বাতাসের পানে মুখ করে। বোনকে আসতে দেখে তার চোখ দুটো উজ্জল হয়ে উঠলো, নিঃসঙ্গতা ঘুচে যাওয়ায় সে খুসি হয়েছে। তাকে দেখে, আহারের সন্ধানে ওড়বার ক্লেশকর চিন্তা থেকে সে মুক্তি পেলে। ঈগলছানাকে তার বাপ-মা উড়তে শেখাচ্ছে, কখনো দেখিনি। ক্ষিদের তাড়নায় ছাড়া তারা উড়তে চায় না। বাপ-মা এ কথা ভালোরকম জানে বলেই, বাচ্ছারা ডাগর হয়ে ওড়ার উপযুক্ত হলে তাদের ছেড়ে চলে যায়।

বাচ্ছা বোনটি কষ্টে-স্বষ্টে উঠে উঠে শেষ পর্যন্ত ভায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল, কিন্তু হায়! সেখানে দুজনের ঠাঁই নাই। চূড়ার উপর সাবধানে দুজনে বাঁচিয়ে বসবে কি, বোনের ধাক্কায় ভাই প্রায় উল্টে পড়ার উপক্রম। মুহূর্তে সে তার ডানা মেলে দিলে, বাতাস তাকে উপরে ঠেলে নিয়ে গেল। নখগুলো সে বাড়িয়ে দিলে কিন্তু জমি ছুঁতে পারলে না। শূন্যে হাতখানেকের উপরে সে রয়েছে, ডানা ঝটপট করে' সে আর একটু উপরে উঠলো। বাতাসে সে তার লেজটা ডুবিয়ে দিলে—নৌকার হালের মত তাকে টলাতে লাগলো—পাশের দিকে, পূবে, দক্ষিণে আবার পূবে। সে আমাদের উপর দিয়ে চলেছে, তার ডানার ভিতর দিয়ে বাতাস গুঞ্জন করতে লাগলো। ঠিক সেই সময় সমস্ত জিনিষের উপর একটি

গম্ভীর স্তব্ধতার ধারা নেমে এল; পতঙ্গের গুঞ্জন থেমে গেল; খরগোসেরা—সেখানে থাকলে—গর্ত্তের মাঝে গিয়ে লুকুলো। মনে হল গাছের পাতা পর্যন্ত নীরবে শূন্যদেশের নতুন সম্রাটের পাখার আওয়াজ শুনছে—যতই সে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উঠতে লাগলো। তাকে অনেক উঁচুতে উঠতে হবে, কারণ বহুদূর না গেলে সে যা সন্ধান করছে, তা পাবে না। কখনো কখনো ঈগল ১৮০০ থেকে ৩০৫০ ফুট নীচে দেখতে পায় খরগোস ছুটে বেড়াচ্ছে। তখন সে ডানা মুড়ে ফেলে বাতাসের মাঝ দিয়ে হু-হু শব্দে বিদ্যুতের বেগে নামতে থাকে। তার আসার সেই ভয়ানক শব্দে বেচারা খরগোস একেবারে অসাড় হয়ে পড়ে, সেখান থেকে আর নড়তে পারে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পায় বজ্রের মত শব্দে শত্রু নিকটে আসছে, তারপরে ঈগলের নখ তাকে বিঁধে ফেলে।

এমনি করে ভাই চলে গেল। তা দেখে একলা বসে বসে ভয় পেয়ে বোনটিও হঠাৎ ডানা মেলে ধরলে। নীচে থেকে বাতাস বয়ে' এসে তাকে উপর দিকে ঠেলে দিলে। সেও বাতাসে ভাসতে লাগলো, তারপর লেজের ধাক্কায় সঙ্গীর পানে উড়ে চল্লো, কয়েক মিনিটের মধ্যে দুজনেই অদৃশ্য হল। এইবার পায়রার সন্ধানে এই পাহাড় থেকে আমাদেরও বিদায়ের পালা এল। হয়ত সে দেনৃতামে গেছে। কিন্তু এর আগে ওড়ার সময় যত সব লামাসারি বা মঠ আর ওমরাহের প্রাসাদ তার পথের নিশানা হয়েছিল, তারও প্রত্যেকটিতে খোঁজ করা দরকার।

পাঁচ

পাহাড়ের ঠাণ্ডা সরু পথে যেই নেমেছি, অমনি দেখি সেখানে আঁধার ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে, যদিও এখনো বিকাল তিনটাও বাজেনি। উঁচু পাহাড়ের চূড়ার তলা দিয়ে চলেছি—তাদেরি লম্বা ছায়ায় এমন হয়েছে। চলার বেগ বাড়িয়ে দিলুম, ঠাণ্ডা হাওয়ার তাড়ায় হাজার ফুট খানেক নেমে আসতেই ওরি মধ্যে একটু গরম বোধ হয়েছিল, তবে শীঘ্রই রাত হয়ে এল, আবার ঠাণ্ডা পড়লো, তখন এক লামাসারিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলুম। সেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী লামারা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করলে। রাতের খাবার পরিবেশনের সময় আর সঙ্গে নিয়ে ঘর দেখাবার সময় মাত্র তারা আমাদের সঙ্গে কথা কইলে। সন্ধ্যাটা তারা ধ্যানধারণাতেই কাটায়।

পাহাড়ের গা কেটে তিনটি ছোট ছোট কুঠরি তৈরী হয়েছে—তারই মধ্যে আমরা থাকবো। সামনে এক টুকরো তৃণভূমি, তার বাহিরের সীমানায় বেড়া দেওয়া। হাতের লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পেলুম পাথরের কুঠরির মধ্যে কেবল মাদুর পাতা। যাই হোক, রাত শীঘ্রই কেটে গেল। এত ক্লান্ত হয়েছিলাম যে মায়ের বুকে শিশুর মতই ঘুমিয়ে পড়লুম। পরদিন ভোর চারটা নাগাদ অনেক পায়ের শব্দে ঘুম একেবারে ভেঙ্গে গেল। বিছানা ছেড়ে শব্দের পানে যেতেই উজ্জ্বল আলো চোখে পড়লো। কয়েকটা উঁচু ধাপ নেমে আবার কয়েক ধাপ উঠে লামাসারির

মাঝের ভজনালয়ে গিয়ে পৌঁছলুম—ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের তলায় এক প্রকাণ্ড গুহা, তার তিনদিক খোলা। সেখানে দেখি আটজন লামা লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আলোগুলি ধীরে ধীরে সরিয়ে রেখে আসনপিঁড়ি হয়ে তারা ধ্যান করতে বসলো। তাদের নীল আংরাখা আর হলদে মুখের উপর মৃদু আলো এসে পড়লো। সেই আলোয় দেখতে পেলুম তাদের মুখের শান্তি আর প্রেম।

তাদের অধ্যক্ষ আমায় হিন্দি ভাষায় বল্লে—ঘুমন্ত মানুষের জন্যে প্রার্থনা করা আমাদের অতি প্রাচীন রীতি। আমরা প্রার্থনা করি, যেন ভগবান তাদের ভালো করেন! সকালে ঘুম ভাঙলে তারা যেন দিনের কাজ সুরু করতে পারে সদয় ও নির্মল মন নিয়ে। আমাদের এই প্রার্থনায় যোগ দেবে কি?

আমি তখনি রাজি হলুম। সমস্ত মানুষের প্রতি ভগবানের দয়ার জন্ত আমরা বসে প্রার্থনা করলুম। এখন পর্যন্ত ভোরবেলা ঘুম ভাঙলে হিমালয়ের সেই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কথা মনে পড়ে যায়—ঘুমন্ত নরনারীর মন নির্মল হোক—যারা এই প্রার্থনা করে।

শীঘ্রই সকাল হল। দেখলুম একটা পাহাড়ের চিড়ের মধ্যে আমরা বসে আছি, আর আমাদের পায়ের তলায় শিলাময় ভূখণ্ডদেশ খাড়া নেমে গেছে। রোদ উঠেছে, বাতাসে রূপার ঘণ্টার মৃদু টুংটাং শব্দ—সোনা রূপার ঘণ্টার মধুর ধ্বনিতে আকাশ ভরে উঠলো—আলোর দূতকে সন্ন্যাসীরা নমস্কার করছে। সূর্য উঠলো বিজয়ের তূর্যধ্বনির মত—অন্ধকারের উপর আলোর বিজয়, মৃত্যুর উপর প্রাণের বিজয়।

নীচে এসে দেখি রাজা আর ঘণ্ডালু খেতে বসেছে। একজন সন্ন্যাসী পরিবেশন করছিলেন, তিনি বল্লেন, কাল তোমার পায়রা এখানে আশ্রয় নিতে এসেছিল। তিনি চিত্রগ্রীবের বর্ণনা দিলেন—তার পায়ের রং, আয়তন, এমন কি তার নাকের মাংসের থুপি পর্যন্ত—সমস্তই নিখুঁত। ঘণ্ডালু জিজ্ঞাসা করলে, কেমন করে জানলেন আমরা পায়রার খোঁজে এঁসেছি? থ্যাব্ড়া-মুখ লামা সহজ সুরে তখনি বলে দিলেন, তোমার মনের কথা আমি জানতে পারি। রাজা আগ্রহভরে প্রশ্ন করলে, কেমন করে বলুন না!

সন্ন্যাসী বল্লেন, ভগবান বুদ্ধের কাছে যদি রোজ সকল প্রাণীর সুখের জন্মে চারঘণ্টা করে প্রার্থনা করো, তাহলে বছর বারোর মধ্যে তিনি তোমাদের অন্যের মনের কথা বোঝবার ক্ষমতা দেবেন; বিশেষ করে এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের মনের কথা......তোমার পায়রা যখন আমাদের আশ্রয়ে ছিল, তখন তাকে আমরা খাইয়েছি আর তার ভয় সারিয়ে দিয়েছি।

অবাক হয়ে বলে ফেল্লুম, ভয় সারিয়েছেন!

লামা বল্লেন, হ্যাঁ। তার ভারি ভয় হয়েছিল, আমি তাকে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লুম, ভয় নেই, ভয় নেই! তারপর কাল সকালে তাকে যেতে দিলুম। তার কোন বিপদ হবে না!

ঘণ্ডালু বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, এরকম কেন বলছেন বুঝিয়ে দেবেন কি?

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, তুমি শিকারীর সেরা, তুমি অবশ্য জানো যে কোন জন্তু, মানুষও, কখনো শত্রু দ্বারা আক্রান্ত বা নিহত হয় না,

যতক্ষণ না শত্রু তাকে ভয় পাওয়াতে পারে। ভয় না পেলে, দেখেছি, খরগোস পর্যন্ত শিকারি কুকুর বা খেঁকশিয়ালের আক্রমণ থেকে নিস্তার পায়। ভয়ে মানুষের বুদ্ধি চাপা পড়ে, শক্তি অসাড় হয়। ভয়ের হাতে যে আপনাকে সঁপে দেয় মরণকে সে ডেকে আনে।

"কিন্তু পাখীর ভয় কেমন করে সারিয়ে দেন প্রভু?"

রাজার প্রশ্নের উত্তরে সন্ন্যাসী বল্লেন, তুমি যদি নিজে নির্ভয় হও আর তোমার চিন্তাকে যদি পবিত্র রাখো, শুধু তাই নয়, যদি তোমার ঘুমকে কয়েকমাস ভয়ভরা স্বপ্নের কলুষ থেকে রক্ষা করতে পারো, তা হলে তুমি যা কিছু স্পর্শ করবে তাই সম্পূর্ণ নির্ভয় হবে। তোমাদের পায়রা এখন নির্ভয় হয়েছে কারণ আমি তাকে হাতে ধরেছি—আর আমি প্রায় বিশবছর চিন্তায় কাজে বা স্বপ্নে ভয় পাইনি। বর্তমানে তোমার পোষা পাখী নিরাপদ—তার কোন বিপদ হবে না।

তাঁর কথার স্থির বিশ্বাসের সুরে আমার মনে হল যথার্থই চিত্রগ্রীব নিরাপদ। আর সময় নষ্ট না করে বুদ্ধভক্তদের কাছে বিদায় নিয়ে দক্ষিণে যাত্রা করলুম। আমার মনে আর সন্দেহ নাই যে আমাদের কথাই ঠিক। প্রতিদিন সকালে অন্যের ভালর জন্য প্রার্থনা করলে পবিত্র চিন্তা, সাহস আর ভালবাসা দিয়ে দিনের কাজ আরম্ভ করা যায়।

এবার আমরা তাড়াতাড়ি দেন্‌তামের দিকে নামতে লাগলুম। আমাদের যাত্রাপথের আশপাশ চেনা চেনা ঠেকছে, ঠাণ্ডাও ক্রমেই কমে আসছে, রডডেন্‌ড্রন্‌ আর চোখে পড়ে না। যে শরতের

ছোঁয়া লেগে উপরের গাছের পাতায় পাতায় গাঢ় লাল, সোনালী গোলাপী বা তামাটে রঙের ছোপ ধরেছিল সে শরৎ এখানে ততটা পরিণত নয়। চেরিগাছে এখনো ফল আছে; গাছে গাছে পুরু শেওলা জমেছে; বাতাস তাদের উপর অর্কিডের রেণু উড়িয়ে এনে ফেলেছিল, সেখানে হাতের তালুর মত বড়ো বড়ো ঘোর লাল ও বেগুনি রঙের ফুল ফুটেছে। প্রখর রোদের তাপে সাদা সাদা ধুতুরার গায়ে শিশিরবিন্দু লেগে আছে স্বেদবিন্দুর মত। গাছগুলো ক্রমেই দীর্ঘতর আর ভীষণদর্শন হয়ে উঠছে। বাঁশগুলো মসজিদের চূড়ার মত উপরপানে উঠে যেন আকাশকে বিঁধতে চায়। পাহাড়ী সাপের মত মোটা মোটা লতানে গাছ আমাদের পথ ঘিরে আছে। ঝিঁঝির ডাক অবিরাম আর অসহ্য হয়ে উঠলো, বনের মাঝে ছাতারের খিচিমিচি চলছে। মাঝে মাঝে সবুজ টিয়ার দল সূর্যের মুখে তাদের মরকত-মহিমার ছায়া ফেলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পোকা মাকড় পতঙ্গের সংখ্যা বেড়ে গেল। বড়ো বড়ো প্রজাপতি, মখমলের মত কালো, ফুলে ফুলে ভিড় করেছে; আর অসংখ্য ছোট পাখী ভনভনে পতঙ্গ শিকার করছে। কখনো কখনো পোকার তীক্ষ্ণ হুলের জ্বালা, কখনো বা পথের উপর দিয়ে সাপ চলেছে, তার পার হওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। ঘণ্ডালুর দৃষ্টি অভ্যস্ত, কোন্ পথে জন্তুরা আসা যাওয়া করে সে জানে, নইলে সাপ বা বাইসনের হাতে এতক্ষণে দশবার আমরা মারা পড়তুম। কখনো কখনো ঘণ্ডালু মাটির উপর কান পেতে শোনে। কয়েক মিনিটের পর সে বলে—সামনের দিক থেকে বাইসনের দল আসছে, তারা চলে না যাওয়া পর্যন্ত এস আমরা

দাঁড়াই। অচিরেই তাদের ধারালো ক্ষুরের শব্দ কানে পৌঁছয়—খস্ খস্, খস্ খস্! আগাছার জঙ্গলের মাঝ দিয়ে তারা এগিয়ে আসছে, আওয়াজ শুনলে অমঙ্গলের ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে, মনে হয় যেন একটা বিরাট কাস্তে আমাদের পায়ের তলার জমিটা কেবলই কেটে কেটে চলেছে। তবুও আমরা এগিয়ে চল্লুম, জলযোগের জন্ত কেবল আধঘণ্টা কাটিয়ে। অবশেষে আমরা সিকিমের সীমানায় এসে পৌঁছলুম। সেখানকার ছোট উপত্যকাটি প্রায়-পাকা লাল ভুট্টায়, সবুজ কমলানেবু আর সোনালি কলায় ঝিকমিক করছে, পাহাড়ের গায়ে গাঁদার ঝলমলানি আর তার উপর ভায়োলেটের হাসি।

ঠিক সেই সময় এমন একটি দৃশ্যের সামনে এসে পৌঁছলুম, যা কখনো ভুলবো না। আমাদের পায়ের তলায় সরু চলার পথে বাতাস ইন্দ্রধনুর রকমারি রঙে জ্বলছে; উত্তাপ এত বেশি যে তার কাঁপুনি থেকে রং ঠিকরে পড়ছে। কয়েক পা যেতে না যেতেই বাজের মত শব্দে প্রকাণ্ড এক ঝাঁক হিমালয়ের 'ফেয্যাণ্ট' আকাশে উঠলো; তারপর তারা জঙ্গলে উড়ে গেল, তপ্ত হাওয়ায় তাদের ডানা ময়ূরপুচ্ছের মত জ্বলতে লাগলো। চলতে লাগলুম, মিনিট দুই পরে আর এক ঝাঁক উঠলো, কিন্তু এরা মেটে রঙের। মনে সংশয় হল, ঘণ্ডালুকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলুম।

সে বল্লে, দেখছ না, যে গাড়ি এখান দিয়ে গেছে তাতে ভুট্টা ছিল? একটা থলি ছেঁদা থাকায় তার মাঝ দিয়ে মুঠোকয়েক ভুট্টাদানা রাস্তায় পড়ে যায়। পরে ওই পাখীরা এসে ভুট্টাদানা খেতে থাকে। আমরা হঠাৎ এসে পড়ায় ভয় পেয়ে উড়ে গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, পুরুষগুলো এমন চমৎকার আর মেয়েরা অমন মেটে রঙে্র কেন? প্রকৃতি সর্বদাই পুরুষের পক্ষপাতী কেন?

ঘণ্ডালু বুঝিয়ে দিলে—শোনা যায় প্রকৃতি মা-পাখীর গায়ে সেই রং দিয়েছেন যার সাহায্যে শত্রুর কাছে তারা আত্মগোপন করতে পারে। দেখতেই পাচ্ছ ওই পাখীগুলোর এত বাহার যে অন্ধ মানুষও তাদের দেখে মারতে পারে!

রাজা বলে উঠলো, পারে না কি?

ঘণ্ডালু বল্লে, না হে না, অকালপক্ক তা নয়! আসল কারণ, তারা গাছের ওপর বাস করে, মাটি খুব তপ্ত হয়ে ওঠবার আগে নামে না। আমাদের দেশে মাটির দু'ইঞ্চি ওপরের বাতাসও এমন গরম যে তা থেকে অসংখ্য রং ঠিকরে পড়ে, 'ফেয্যান্ট্'এর লেজও তেমনি। ওদের পানে যখন চাই তখন পাখী দেখি না, দেখি বহুরঙা বাতাস, যা তাদের সম্পূর্ণ গোপন করে। এই একটু আগে আমরা প্রায় তাদের ঘাড়ে এসে পড়েছিলুম—মনে হয়েছিল তারা আমাদের পায়ের তলার পথেরই অংশ!

রাজা সবিনয়ে বল্লে, এটা বুঝতে পারলুম। কিন্তু মেয়েরা মেটে রঙের কেন, আর তারা পুরুষদের সঙ্গে উড়েই বা না গেল কেন?

ঘণ্ডালু নিঃসংশয়ে উত্তর দিলে, শত্রু এসে যখন হঠাৎ তাদের সামনে উপস্থিত হয়, পুরুষগুলো তখন ওপরে ওড়ে শত্রুর গুলির সমুখে দাঁড়াবার জন্যে—বীরত্ব প্রকাশের জন্যে যে এমন করে তা নয়।

মেয়েদের ডানা তেমন ভাল নয়। তা ছাড়া, তার গায়ের রং মাটির মত হওয়ায় সে ডানা মেলে বাচ্ছাদের ঢেকে ফেলে, তারপর চেপে মাটির ওপর শুয়ে পড়ে—আপনাকে এমনি করে একেবারে মিশিয়ে দেয়। তাদের নিহত স্বামীদের দেহের সন্ধানে শত্রুরা চলে যাবার পর মেয়েরা বাচ্ছাদের নিয়ে নিকটের ঝোপে উড়ে পালায়...... বছরের গোড়ায় হলে আর বড় বাচ্ছাগুলি সঙ্গে না থাকলে মা-পাখীরা একলাই ডানা মেলে মাটির ওপর পড়ে থাকে, ভাব দেখায় যেন বাচ্ছাগুলিকে রক্ষা করছে। আত্মদান তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সঙ্গে বাচ্ছা থাক বা না থাক তারা অভ্যাসবশেই ডানা মেলে ধরে। আমরা যখন এসে পড়লুম তখন তারা তা-ই করছিল, হঠাৎ তারা বুঝতে পারলে রক্ষা করার মত ত কেউ নেই, তারপর আমরা তখনো এগিয়ে আসছি দেখে তারা উড়ে পালালো, যদিও তারা ভালো উড়তে পারে না।

সন্ধ্যা হয়ে এল। সিকিমের এক ওমরাহের বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিলুম। ভদ্রলোকের ছেলে আমাদের বন্ধু। সেখানে চিত্র-গ্রীবের আরো চিহ্ন দেখলাম। সে বাড়িতে পায়রাটি এর আগে অনেকবার গিয়েছিল। তাই এবার সে পরিচিত জায়গায় গিয়ে ভুট্টা বীচি খেয়েছে, জলপান করেছে, স্নানও সেরেছে। ডানার পালকগুলিও গুছিয়েছে, দুটি কচি আসমানি রঙের পালক ফেলে গেছে—সুন্দর রং দেখে আমার বন্ধু সে দুটি রেখে দিয়েছিল। তা দেখে আনন্দে আমার বুক ভরে গেল, সে রাতে খুব শান্তি আর তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমলুম। সুনিদ্রার আর এক কারণ ছিল, ঘণ্ডালু

ভালো করে বিশ্রাম করতে বলেছে, কারণ পরদিন পথচলার পর জঙ্গলে রাত কাটাতে হবে।

পরদিন রাতে গভীর বনে গাছের ডগায় যখন বসে আছি, তখন কেবলই সিকিমের বন্ধুর বাড়ি আর সেখানকার আরামের কথা মনে পড়তে লাগলো। সারাদিন পথ চলার পর ভয়ানক বনের ভিতরে প্রকাণ্ড এক বটগাছের উপর বসে রাত কাটানোর কথা একবার কল্পনা করো! গাছটি খুঁজে বার করতে আধ ঘণ্টারও কিছু বেশি সময় লাগলো, কারণ উঁচু জায়গায় বটগাছ সাধারণত জন্মায় না। তা ছাড়া যে কারণে আমরা অন্য গাছের বদলে বটগাছ পছন্দ করি, ঠিক সেই কারণেই বড়ো বটগাছের সন্ধান করলাম—হাতী পিছু হেঁটে ঠেলা দিয়ে যে গাছ ভাঙতে পারে, তেমন পল্‌কা গাছে আমাদের ত চল্‌বে না! খুব উঁচু আর খুব শক্ত গাছ দরকার, হাতী শুঁড় বাড়িয়ে যার উপরের ডালে নাগাল পাবে না, আর দুটো মর্দা হাতী ধাক্কা দিয়েও যে গাছকে ফেলতে পারবে না।

অবশেষে পছন্দ সই একটি গাছ পাওয়া গেল। রাজা দাঁড়ালো ঘণ্ডালুর কাঁধের উপর, আর আমি দাঁড়ালাম রাজার কাঁধের উপর, এই উপায়ে মানুষের ধড়ের মত মোটা এক ডালে গিয়ে পৌছলাম। ডালের উপর চড়ে বসে দড়ির মই ঝুলিয়ে দিলাম। জঙ্গলে যাবার সময় এই দড়ির মই সর্বদা আমাদের সঙ্গে থাকে—কখন কি দরকার হয় বলা ত যায় না! রাজা উঠে আমার পাশে এসে বসলো, তারপর ঘণ্ডালু এসে আমাদের মাঝের স্থানটি দখল করলে। দেখতে পেলাম, আমাদের নীচে, যেখানে ঘণ্ডালু দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানটা কয়লার

খনির ভিতরের মত অন্ধকার হয়ে উঠেছে; শুধু তাই নয়, সেখানে পাশাপাশি দুটি সবুজ আলো চক্‌চক্ করছে। সে যে কি খুব ভালোই জানি। ঘণ্ডালু ফুর্তি করে বল্লে, আর মিনিট দুই ওখানে দেরী হলেই আঁজিকাটা জানোয়ারটা আমায় সাবাড় করতো।

শিকার পালিয়েছে দেখে বাঘ একটা ভীষণ চীৎকার দিলে। অমনি চারিদিক স্তব্ধ হয়ে গেল—ছোটখাট জীব জন্তু পতঙ্গের সমস্ত শব্দ চাপা পড়ে গেল। সেই স্তব্ধতা নেমে নেমে শেষে মাটির মধ্যে প্রবেশ করলে, মনে হল যেন গাছের শিকড়গুলোকে পর্যন্ত তা চেপে ধরেছে।

গাছের ডালের উপর সকলে বাগিয়ে বসলুম। দড়ির মই ঘণ্ডালু নিজের কোমরের চারিদিকে জড়িয়ে নিলে, তারপর রাজার ও আমারও কোমর তা দিয়ে জড়ালে। বাকি অংশ গাছের আসল গুঁড়ির চারিদিকে জড়ানো হল। এক এক জনের ভার দিয়ে দড়ির জোর পরখ করা হল। এ রকম করার উদ্দেশ্য, ঘুমের ঘোরে কেউ যাতে দড়ি ছিঁড়ে জঙ্গলের মাঝে না পড়ে। তোমরা সবাই জানো, ঘুমের ঘোরে দেহ এমন আলগা হয়ে যায় যে তা একেবারে পাথরের মত ঝুপ্ করে পড়তে পারে। তারপর যখন ঘুম এল, তখন ঘণ্ডালু তার হাত বালিসের মত করে আমাদের মাথার তলে ছড়িয়ে দিলে।

এমনিভাবে সাবধান হবার পর, আমাদের নীচে কি ঘটছে তার দিকে মন দিলাম। গাছের তলা থেকে বাঘ অদৃশ্য হয়েছে। পতঙ্গেরা আবার তাদের গান সুরু করেছে, দূরের গাছ থেকে প্রকাণ্ড

প্রকাণ্ড মূর্তি ধুপ করে যেই পড়ছে, অমনি সেই গান কয়েক মুহূর্তের জন্য থেমে যাচ্ছে। চিতা আর পান্থার সারাদিন গাছের উপর ঘুমোবার পর এখন শিকারের আশায় লাফিয়ে নামছে।

তারা চলে যাবার পর ব্যাঙ, কড়র্ কড়র্ করে ডাকতে লাগলো, কীট পতঙ্গের গুঞ্জন অবিরাম হয়ে উঠলো, প্যাঁচার কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল। কলরব, হীরার মত, তার অসংখ্য মুখ খুলে ধরলে। শব্দ লাফিয়ে কানে ঢুকতে লাগলো খোলা চোখে রোদের শলাকার মত। সামনের সব জিনিষ ভেঙে চুরে একটা বন-বরাহ চলে গেল। এর কিছু পরেই ব্যাঙের ডাক থেমে গেল, তারপর দূরে জঙ্গলের মেঝের উপর লম্বা ঘাস আর আগাছাগুলো খড়ের গাদার মত উঁচু হয়ে উঠে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে আবার নেতিয়ে পড়লো।

ঢেউয়ের মাথায় ফেনা যেমন পাক খেয়ে ওঠে, তেমনি করে সেই মৃদু অথচ দুষমণ শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগলো, তারপর ···আস্তে আস্তে আমাদের গাছের ধার দিয়ে চলে গেল। আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। সে এক অজগর—জলের ডোবায় চলেছে। গাছের ডগায় আমরা চুপ করে বসে রইলুম—ঘণ্ডালুর ভয় ছিল পাছে আমাদের নিশ্বাসের শব্দে ভয়ানক অজগরটা আমাদের সন্ধান পায়।

কয়েক মিনিট পরে আমরা কচি ডাল ভাঙার দু'একটা পটপাট শব্দ শুনতে পেলুম—এত মৃদু, মনে হল যেন কেউ আঙুল মটকাচ্ছে। হরিণের শিং লতার মধ্যে জড়িয়ে যাওয়ায় সে লতা ছিঁড়ে শিং ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। হরিণটা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গল নীরব হয়ে উঠলো—শব্দ মিলিয়ে যেতে লাগলো। যে-সব রকমারি

শব্দ আমরা একসঙ্গে শুনতে পাচ্ছিলুম তার মধ্যে কেবল তিনটি শব্দ অবশিষ্ট রইলো। পতঙ্গের টিন্-ট্যাক্-ট্যাক্; হরিণের ক্ষণস্থায়ী আর্তরব—অজগর তাকে নিশ্চয়ই জলের ডোবার ধারে গলায় ফাঁস দিয়ে মারছে—আর মাথার উপরে বাতাসের শব্দ। এইবার হাতীরা আসছে। একদল হাতী—প্রায় পঞ্চাশটি—আমাদের নীচে এসে খেলা জুড়ে দিলে। মেয়েদের চীৎকার, পুরুষদের ঘোঁৎঘোঁতানি, আর বাচ্ছাদের ছুটোছুটির শব্দে বাতাস ভরে উঠলো।

পরে কি ঘটলো মনে নাই, একটু যেন তন্দ্রা এসেছিল সেই অবস্থায় শুনতে পেলুম আমি যেন চিত্রগ্রীবের সঙ্গে পায়রার ভাষায় কথা বলছি। স্বপ্ন আর ঘুমের একটা গোলমেলে জড়ামড়ি অবস্থা। কে আমাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলে। অবাক হয়ে শুনলুম ঘণ্ডালু ফিসফিস করে বলছে—আর তোমাকে ধরে থাকতে পারি না। আর ঘুমিয়ো না! বিপদের সম্ভাবনা! একটা পাগলা হাতী পিছনে পড়ে আছে। সেটার মতলব ভালো নয়। আমরা খুব উঁচুতে নেই—তারা শুঁড়ের নাগালের বাইরে নয়। শুঁড় উঁচু করে ধরলে সে আমাদের গন্ধ পাবে। বুনো হাতি মানুষকে ভয়ও যেমন করে ঘৃণাও তেমনি করে, আমাদের গন্ধ একবার নাকে গেলে সারাদিন এখানে থেকে আমাদের খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে। তাই বলছি হুঁসিয়ার! শত্রু আক্রমণ করবার আগে তৎপর হওয়া চাই!

হাতী সম্বন্ধে ভুল হয়নি। ভোরের ঝাপসা আলোয় দেখি আমাদের গাছের তলায় যেন ছোটখাট একটি পাহাড় ঘুরে বেড়াচ্ছে।



গাছে গাছে গিয়ে সে সরু সরু রসালো ডালপালা ভেঙে নিচ্ছে—যেগুলো তখনো শুকিয়ে যায়নি। অসময়ের দুষ্প্রাপ্য সুখাদ্যে সে পেট ভরিয়ে নিতে চায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলে। সামনের দুই পা একটা মোটা গাছের গুঁড়ির উপর তুলে দিয়ে শুঁড় উপর পানে ছুঁড়ে দিলে। প্রাচীনকালের অতিকায় হাতীর মত তাকে দেখতে হল; এমনি করে সে প্রায় গাছের ডগা থেকে সরস ডালপালা মুচড়ে ছিঁড়ে নিতে লাগলো। সেগুলি নিঃশেষ হলে সে আমাদের গাছের পাশে একটা গাছে, ঠিক তাই করতে লাগলো। একটি শীর্ণ গাছ এবার তার নজরে পড়লো। সেটিকে শুঁড় দিয়ে টেনে নামিয়ে সেই বাঁকা রোগা গাছটির উপর সামনের দুই পা রাখলে। তার চাপে মড়মড় করে গাছটি ভেঙ্গে গেল। তা থেকে যতটা পারে খেলে। এমনি ভাবে তার সকালের আহার যখন চলছে, তখন তার লম্ফঝম্পে ভয় পেয়ে পাখীরা শূন্যে উড়তে লাগলো আর বাঁদরেরা গাছে গাছে লাফালাফি করে কিচিমিচি জুড়ে দিলে। হাতীটা তখন ভাঙা গাছের গুঁড়ির উপর পা তুলে দিয়ে আমাদের গাছের পানে শুঁড় বাড়িয়ে যে-ডালের উপর আমরা বসে ছিলুম সেই ডালটা ধরে ফেল্লে। যেই তেমনি করা অমনি সে এক হাঁক দিয়ে তাড়াতাড়ি শুঁড় নামিয়ে নিলে। সব প্রাণীই মানুষের গন্ধে ভয় পায়। আপন মনে ঘোঁত ঘোঁত করে অসন্তোষ প্রকাশ করে আবার সে ঘণ্ডালুর মুখের খুব কাছে শুঁড় তুলে ধরলে। ঠিক সেই সময় ঘণ্ডালু হাতীটার প্রায় নাকের মধ্যেই ফ্যাঁচ্ করে দিলে হেঁচে। হাতীটা বেজায় ভয় পেলে—মনে হল মানুষে তাকে যেন ঘিরে ফেলেছে। সন্ত্রস্ত দানবের মত বৃংহন

করতে করতে সে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে ছুটে চল্লো, সামনে যা কিছু পড়লো সমস্ত ভেঙে চুরে দিয়ে। আবার টিয়ার দল ফেঁপে-ওঠা নৌকার সবুজ পালের মত আকাশে উড়লো। বাঁদরেরা কিচিমিচি করে গাছে গাছে ছুটাছুটি সুরু করে দিলে। বনবরা আর হরিণ জঙ্গল ভেদ করে প্রাণভয়ে ছুটলো। কিছুক্ষণ ধরে সোরগোলের আর সীমা রইলো না। বাড়ির দিকে যাত্রা সুরু করবার জন্য গাছ থেকে নামবার সাহস হল না—কিছুক্ষণ আমরা সেখানেই বসে রইলুম।

ভাগ্যক্রমে এক যাত্রিদলের সঙ্গে পথে দেখা হওয়ায় তাদের ঘোড়ায় চড়ে সন্ধ্যার কাছাকাছি বাড়ী পৌছলুম। তিনজনেই শ্রান্তিভারে অবসন্ন, কিন্তু দেনতামে আমাদের বাড়ীতে চিত্রগ্রীবকে দেখে শ্রান্তির কথা আর মনে রইলো না। কী আনন্দ! রাতে শুতে যাবার আগে সেই লামার ধীর স্থির আশ্বাসবাণীর কথা মনে পড়লো, যিনি বলেছিলেন—তোমার পাখী নিরাপদ!

ছয়

কিন্তু আমাদের ফেরবার পরদিন চিত্রগ্রীব আবার সকালে উড়ে গেল, তারপর আর ফিরে এল না। চারদিন ধরে তার জন্য অপেক্ষা করে যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, তখন ঘণ্ডালু আর আমি তার সন্ধানে বার হলুম—জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাকে খুঁজে বার করাই আমাদের সঙ্কল্প। সিকিম পর্যন্ত যাওয়ার জন্য দুটি টাট্টু ভাড়া করা হল। প্রত্যেক গ্রামের মাঝ দিয়ে যাবার সময় চিত্রগ্রীবের খবর নিয়ে নিয়ে আমাদের গন্তব্য পথ স্থির হল। অনেকেই পাখীটিকে দেখেছে, কেহ কেহ তার নিখুঁত বর্ণনা পর্যন্ত দিলে, এক জন শিকারি এক লামাসারিতে এক বাড়ীর কার্নিশের তলায় আর একটা ছোট পাখীর পাশে তাকে বসে থাকতে দেখেছে; এক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বল্লে, সিকিমে তাদের মঠের কাছে নদীর ধারে যেখানে বুনোহাঁসের বাসা, সেখানে তাকে দেখেছে; আমাদের যাত্রার পর দ্বিতীয় দিন বিকালে শেষ গ্রামের মাঝ দিয়ে যাবার সময় শুনলুম এক ঝাঁক ছোট পাখীর দলে তাকে দেখা গেছে।

এমনি সব সু-খবর শুনতে শুনতে আমরা সিকিমের সর্বোচ্চ অধিত্যকায় গিয়ে পৌছলুম—তৃতীয় রাত সেখানেই জেগে কাটলো। টাট্টুগুলোর ঘুম এসেছিল, আমাদের অবস্থাও তেমনি। ঘণ্টাখানেক আন্দাজ ঘুমিয়েছি মনে হল, তারপরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। চারিদিকে একটা কঠিন স্তব্ধ ভাব; ভারবাহী পশুদুটো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশে আধখানা চাঁদ; সেই চাঁদের আর আগুনের আলোতে দেখলুম তারা কান খাড়া করে সন্তর্পণে কি যেন শুনছে। এমন কি

তাদের লেজ পর্যন্ত নড়ছে না। আমিও একমনে শুনতে লাগলুম। সন্দেহ নাই যে রাতের এই নীরবতা কেবলমাত্র স্তব্ধতা নয়; স্তব্ধতা হল ফাঁকা, কিন্তু এই নীরবতা, যা আমাদের ঘিরে ধরেছে, এটি অর্থে ভরা; যেন কোনো দেবতা জ্যোৎস্নার জুতা পরে আমার এত কাছ দিয়ে হেঁটে চলেছেন যে হাত বাড়ালেই তাঁকে ছুঁতে পারি!

ঠিক সেই সময় টাট্টুগুলো তাদের কান নাড়লে—নীরবতার মাঝ দিয়ে অগোচরে যে শব্দ চলে আসছে তারই প্রতিধ্বনি ধরবার জন্য। দেবতা চলে গেছেন; চারিদিকের কঠিন ভাব যেন কেটে যাচ্ছে এমনি একটা অদ্ভুত অনুভূতি সুরু হল। ঘাসের অতি মৃদু কাঁপনও অনুভব করছি, কিন্তু তা-ও ক্ষণেকের জন্য; টাট্টুগুলো উত্তর দিক থেকে একটা নতুন শব্দ শোনবার জন্য কান খাড়া করে আছে। অবশেষে আমিও শুনতে পেলুম। ঘুমের ঘোরে শিশুর হাই তোলার মত কি একটা শব্দ কানে এল, তারপর আবার নীরবতা। তারপর বাতাসের মাঝ দিয়ে টানা দীর্ঘনিশ্বাসের মত একটা শব্দ ছুটে গেল; সেই শব্দ ক্রমে নীচে নামতে লাগলো—যেন একটি পুরু সবুজ পাতা স্থির জলের মাঝে আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। তারপর দিগন্তে একটি মৃদু গুঞ্জন উঠলো—আকাশের সীমায় কে যেন আরাধনা করছে! মিনিট খানেক পরে ঘোড়াগুলো কান আলগা করে দিলে, তাদের লেজ দোলাতে লাগলো, আমিও যেন হালকা বোধ করলুম। ঐ যে হাজার হাজার হাঁস অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে চলেছে! তারা আমাদের প্রায় চার ফুট উপরে, তবুও টাট্টুগুলো আমার অনেক আগে তাদের আসার শব্দ শুনতে পেয়েছে।

হাঁসের ওড়া দেখে বোঝা গেল রাত পোহাতে আর দেরী নাই। আমি উঠে বসে দেখতে লাগলুম। একে একে তারাদল অস্তে নামলো। টাট্টু গুলো চরে চরে ঘাস খেতে সুরু করলে। আমি তাদের দড়িতে ঢিল দিলুম। রাত শেষ হল, এখন আর আগুনের এত কাছে তাদের বেঁধে রাখবার দরকার নাই।

আর দশ মিনিটে ভোরবেলার গভীর স্তব্ধতার মাঝে সমস্ত জিনিস বাঁধা পড়লো—আমাদের জন্তুগুলোও বাদ গেল না। এবার আমি স্পষ্ট দেখলুম তারা মাথা তুলে শুনছে। কোন্ শব্দ কানে ধরবার তারা চেষ্টা করছে? বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নিকটেই এক গাছে একটা পাখী ডানা ঝটপট করে উঠলো, তারপর অপর এক ডালে আর একটা পাখী তাই করলে। তাদের মধ্যে একটা গান ধরলে। সেই গানে সমস্ত প্রকৃতি জেগে উঠলো। অন্য পাখীরা ঝঙ্কার দিলে, তারপর আরো পাখী, তারপর আরো। এইবার চারিদিকের চেহারা আর রং অতি দ্রুত স্পষ্ট হতে লাগলো। এমনি করে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ক্ষণস্থায়ী উষার অবসান হল, ঘণ্ডালু ভগবানের নাম করবার জন্য উঠে বসলো।

সেদিন আমরা শিঙ্গালেলের কাছের লামাসারিতে এসে পৌঁছলুম। লামারা সানন্দে চিত্রগ্রীবের সমস্ত খবর দিলেন। তাঁরা জানালেন আগের দিন বিকালে চিত্রগ্রীব আর তার সঙ্গী 'সুইফ্‌ট্' পাখীর দল, যারা মঠের কার্নিশের তলে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা দক্ষিণমুখো উড়ে গেছে।

লামাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা বিদায় নিলুম। আবার

চিত্রগ্রীবের সন্ধানে যাত্রা। শেষবার গিরিশ্রেণীর পানে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম তারা মশালের মত জ্বলছে। সামনে শরতের ছোপ-ধরা বন সোনালী, বেগুনী, সবুজ আর ফিকে লালে ঝিকমিক করছে!



সাত

কার্তিকমাসের এক দুপুরে দার্জিলিং ষ্টেশনে আমরা ট্রেনে চেপে বসলুম সহরে ফেরার জন্য। চিত্রগ্রীব তার খাঁচায় বসে দেনৃতাম থেকে সিঙ্গালেল যাওয়া-আসার গল্প সুরু করলে—

"তুমি অনেক ভাষা শিখেছ, মানুষের ভাষা আর জীবজন্তুর ভাষা দুয়ের ওপরই তোমার সমান দখল, আমার কথা শোনো—তুচ্ছ এক পাখীর এলোমেলো অস্পষ্ট কাহিনী। নদীর জন্ম পাহাড়ে—আমার গল্পের উৎপত্তিও সেইখানে।

"ঈগলের বাসার কাছে দুরাত্মা বাজকে নখ দিয়ে আমার মাকে খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলতে দেখে মনের অবস্থা এমন হল যে স্থির করলুম, আমিও মরবো, কিন্তু সেই সয়তান পাখীর নখাঘাতে নয়। যদি কারও খাদ্যে পরিণত হতে হয়, তবে আকাশের রাজা ঈগলের খাদ্য হওয়াই ভালো। তাই আমি ঈগলের বাসার কাছে চত্বরে গিয়ে বসেছিলুম, কিন্তু তারা আমার কোনো ক্ষতি করলে না। তাদেরও তখন শোকের সময়। তাদের বাপ ফাঁদে ধরা পড়ে মারা গেছে; মা খরগোস আর পাখী শিকার করতে চলে গেছে। এ পর্যন্ত ঈগলছানাব মা-বাপের মারা শিকারই খেয়েছে, জীবন্ত আমাকে আক্রমণ করে মারবার সাহস বোধ করি তাদের হল না। গত কয়েক দিনে অনেক ঈগল দেখলুম, জানি না কেন তাদের মধ্যে কেউ আমার কোনো ক্ষতি করেনি।

"তারপর তুমি এলে আমায় ধরে খাঁচায় পোরবার জন্যে। মানুষের সঙ্গ নেবার মত মনের অবস্থা ছিল না, তাই আমি উড়ে

পালালুম। ভাবলুম বরাতে যা থাকে তাই হবে। জায়গাগুলো ভুলিনি, তোমার বন্ধুদেরও মনে ছিল, দেন্‌তাম যাবার পথে তাদের কাছেই ছিলুম। দুদিন মাত্র উড়েছিলুম। সেই দু দিনের মধ্যে এক বাজপাখী আমায় আক্রমণ করে, সে সেই সবে উড়তে শিখেছে, তাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিলুম। ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম—সিকিমের নীচে বনের ওপর দিয়ে একদিন সকালে উড়ছি, এমন সময় বাতাসের চীৎকার শুনতে পেলুম—এখন তার অর্থ আমি জানি, তাই একটা চালাকি খেল্লুম। হঠাৎ থেমে গেলুম। বাজপাখী আমার ওপর পড়ছিল, টিপ ফসকে গিয়ে সে নীচে পড়ে গেল। গাছের মাথায় তার ডানা ঘসে গেল। আমি উঁচুপানে তাড়াতাড়ি উড়তে লাগলুম, কিন্তু সে আমার নাগাল ধরে ফেল্লে। তখন আমি শূন্যে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলুম। উঁচুতে উঠতে উঠতে শেষে এত উঁচুতে উঠলুম যে আর নিশ্বাস নিতে পারি না, তাই আবার নীচে নেমে আসতে হল।

"কিন্তু যেই নেমেছি অমনি ভয়ানক চীৎকার করে বাজ আমার ওপর পড়লো। ভাগ্যক্রমে তখনি, আমার জীবনে সেই প্রথম, বাবাকে যেমন করতে দেখেছিলুম তেমনি করে ডিগবাজি খেতে চেষ্টা করলুম। জোড়া ডিগবাজি খেয়ে ফোয়ারার মত ওপরে লাফিয়ে উঠলুম। বাজ আবার টিপ্‌ ফসকে আক্রমণ করতে উঠলো, কিন্তু আমি তাকে সে সুযোগ দিলুম না। আমি তার দিকে তেড়ে গেলুম। ঠিক যেই তাকে পেরিয়ে যাব, অমনি সে নীচুপানে ডুব দিয়েই উঠে পড়ে আমায় আঁকড়ে ধরতে গেল। আবার

আমি ডিগবাজি খেলুম—তাকে এত জোরে ধাক্কা দিলুম যে সে তাল সামলাতে পারলে না। কি যে হল জানি না, কিন্তু মুহূর্তে মনে হল কি যেন আমায় নীচের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, একেবারে পাতালের মধ্যে। আমার ডানা অবশ হয়ে গেছে। ঈগল যেমন পড়ে, আমি তেমনি পড়লুম পাথরের মত, অব্যর্থ—আমার সমস্ত ভার দিয়ে বাজের মাথায় ঘা দিলুম। মনে হয় সেই আঘাতে সে অচেতন হয়ে গেল। সে-ও পড়লো, নীচের বনে সে হারিয়ে গেল। আমি দেখি একটা গাছের ডালের ওপর গিয়ে পড়েছি।

"বাতাসের স্রোত আমায় নীচে টেনে নিয়েছিল। সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতার পর আমি সে রকম আরো অনেক দেখেছি, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি কোনো কোনো গাছ বা জলধারার ওপর কেন বাতাস খুব ঠাণ্ডা হয়ে উঠে একটা স্রোতের সৃষ্টি করে, আর কোনো পাখী সেই স্রোতের মাঝে গিয়ে পড়লে তাকে তার মধ্যে টেনে নেয়। সেই স্রোতের মাঝে ওপর নীচে ঘুরপাক খেয়ে তবে তার মাঝে উড়তে শিখি। কিন্তু ওরকম স্রোতকে আমি ঘৃণা করি না। কারণ প্রথম বাতাসের স্রোতের মাঝে পড়ি, তাই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

"সেই গাছের ওপর বসে বসে ক্ষিদের জ্বালায় বাড়ির দিকে যাত্রা করতে হল। ভাগ্যক্রমে এবার কোনো বাজপাখী আমার তীরের মত গতিকে বাধা দেয়নি।

"কিন্তু সেই বাচ্ছা ঘাতকের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আমার সাহস ফিরিয়ে পেলুম, আর যেই তুমি বাড়ি এলে অমনি আপনমনে

বললুম, এবার আমার বন্ধু দেখেছে আমি বেঁচে আছি, আর সে আমার জন্যে ভাববে না। শিকরে-ভরা শূন্য ভেদ করে আবার উড়তে হবে আমার সাহস পরখ করবার জন্যে!

"এবার আমার আসল গল্পের সুরু। উত্তরে ঈগলের বাসায় গেলুম লামাসারিতে আশ্রয় নিলুম, সেখানে আগের বার এক সাধু আমায় আশীর্বাদ করেছিলেন। সেখানে আমার পুরানো বন্ধু সেই ছোটপাখী-দম্পতীর সঙ্গে আবার দেখা করলুম। তারপর আরো উত্তরে সিঙ্গালেল্ পেরিয়ে ঈগলের বাসায় গিয়া পৌঁছলুম। বাসা শূন্য, ঈগলেরা চলে গেছে। বেশ গুছিয়ে নিয়ে সেখানে বসলুম, কিন্তু খুব যে তৃপ্তি হল তা বলতে পারি না। কারণ ঈগলের বাসায় রাজ্যের জঞ্জাল, আর আমার মনে হয় তা পোকামাকড়ে ভরা। দিনে ঈগলের বাসায় থাকলেও রাতে গাছের ওপর থাকাই স্থির করলুম। সেখানে পোকামাকড়ের উৎপাত নেই। দিন দুই ঈগলের বাসায় যেতে আসতে দেখে স্থানীয় পাখীমহলে আমার সম্ভ্রম বেড়ে গেল। তারা আমাকে ভয় করতো, হয়ত তারা আমাকে এক প্রকার ঈগল বলেই ঠাউরেছিল! শিকরেগুলোও আমার দিকে ঘেঁসে না। এই সব কারণে নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে গেল, তাই একদিন ভোরে অনেক উঁচু দিয়ে একটা পাখীর শ্রেণীকে দক্ষিণে যেতে দেখে তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেলুম। তারা আপত্তি করলে না। সেই বুনোহাঁসের দল রোদে-ভরা সমুদ্রের সন্ধানে লঙ্কাদ্বীপের দিকে চলেছে।

"দু ঘণ্টা ওড়ার পর, দিন যখন তেতে উঠলো, তখন হাঁসগুলো

এক খরস্রোতা পাহাড়িয়া স্রোতস্বতীর ওপর নামলো। ঈগলের মত তারা প্রায়ই নীচুপানে চায় না।—তাদের দৃষ্টি দিগন্তে নিবদ্ধ। বহুদূরে আকাশের গায়ে একটি শ্বেতাভ নীল ফিতা দেখতে পেয়ে ধীরে ধীরে নিম্নগামী এক সরল রেখায় তারা উড়তে লাগলো যতক্ষণ না মনে হল পৃথিবী আমাদের সঙ্গে মেলবার জন্যে উঠে আসছে। তারপর শীঘ্রই সকলে সেই রুপালি স্রোতে ঝাঁপ দিলে, কারণ এখন সেই স্রোতস্বতীর রং নীলের চেয়ে রুপার মত সাদা দেখাচ্ছে। তারা জলের ওপর ভাসতে লাগলো, কিন্তু আমি জানি তাদের মত আমার আঙুল জোড়া নয়, তাই আমি এক গাছের ওপর বসে তাদের খেলা দেখতে লাগলুম। তোমরা জানো হাঁসের ঠোঁট কি রকম চেপ্টা আর বিশ্রী, কিন্তু আমি এখন তার কারণ বুঝতে পারলুম। নদীপাড়ে গেঁড়ি শামুক প্রভৃতির মত যে-সব জিনিস জন্মায় সেগুলোর ওপর তাদের ঠোঁট চিমটের কাজ করে। মাঝে মাঝে তারা কোনো লতাগুল্ম বা শামুকের ওপর ঠোঁট রাখছে, তারপর তাকে মোচড় দিয়ে টেনে তুলছে, যেমন করে কসাই পাতিহাঁসের ঘাড় মটকায়। তারপর সে শিকারকে একেবারে গ্রাস করে, জোরালো গলার মধ্যে তাকে চূর্ণ করে ফেলে, গলার বেশি নীচে নামবার আগেই তার আকার কমতে কমতে একেবারে লোপ পায়। কিন্তু সব সময়ে এত সহজে কাজ শেষ হয় না। জলের ধারে এক গর্তে একবার একটা হাঁস একটা মাছ দেখতে পেলে—সরু আর লম্বা চেহারা, সাপের মত। সে তাকে টানতে সুরু করলে। যতই টানে ততই সেটা আরো সরু আর লম্বা হতে থাকে। অনেক

টানাটানির পর একটু একটু করে মাছটাকে গর্তের বার করলে। তারপর হাঁসটা লাফিয়ে লাফিয়ে তীরে উঠে মাছটাকে মাটির ওপর আছড়ে ফেল্লে। যে অংশটা তার ঠোঁটের মধ্যে ছিল সেটা প্রায় গুঁড়ো হয়ে গেছে—ল্যাগব্যাগে শিকারটা যে মরে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এমন সময় কোথা থেকে আর একটা হাঁস ঢুলকি চালে এসে উপস্থিত। (ওড়া বা সাঁতার দেওয়ার সময় ছাড়া হাঁসের মত নড়বড়ে পাখী আর দেখা যায় না। জলের ওপর তাদের দেখলে মনে হয় যেন ঘুম-সরোবরে স্বপ্ন ভেসে বেড়াচ্ছে; আর মাটির ওপর তারা দেখায় যেন লাঠির ওপর ভর দিয়ে খোঁড়া নেংচে নেংচে চলেছে!) দুই হাঁসে ঝগড়া সুরু করে দিলে। ঠোঁট দিয়ে পরস্পরের পালক টানাটানি করে, পাখার ঝাপটা মেরে, মাঝে মাঝে মাটি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে লাথালাথি করে ব্যাপারটা দিব্যি জমিয়ে তুল্লে। ঝগড়ায় মেতে তারা ভুলেই গেছে কিসের জন্যে ঝগড়া; এমন সময় নলখাগড়ার ঝোপের মাঝ থেকে একটা বেড়ালের মত জন্তু, সম্ভবত ভাম, লাফিয়ে পড়ে মরা পাঁকাল মাছটাকে কামড়ে ধরে ঝোপের মাঝে দে ছুট। তখন হাঁসগুলো রণে ক্ষান্ত দিলে। হাঁসগুলোর কি ছাই এক তিল বুদ্ধি আছে? তাদের তুলনায় আমরা পায়রা, বুদ্ধির অবতার বল্লেই চলে!

"তাদের ঝগড়া থামলে সর্দার হাঁস ডাকলে—'ক্র্যাক্ ক্য ক্য ক্য!' অমনি সকলে তাড়াতাড়ি পা দিয়ে জল কেটে গতিবেগ সৃষ্টি করতে লাগলো। তারপর কয়েকটা ডানার ঝাপট, তারপরেই তারা শূন্যে উঠলো। এখন তাদের কি সুন্দর দেখাচ্ছে! অসংখ্য

ডানার সেই মৃদু সাঁই-সাঁই শব্দ, বিলম্বিত গ্রীবা ও দেহ যেন আকাশপটে আঁকা, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সে-দৃশ্য কখনো ভুলবো না।

"কিন্তু প্রত্যেক দলেই দু'একজন দল থেকে ছট্‌কে পড়ে। একটা হাঁস পিছনে পড়ে রইলো, কারণ সে তখনো একটা মাছকে আয়ত্ত করিতে পারেনি, শেষে মাছটাকে ধরে সে একটা গাছের সন্ধানে উড়লো, যেখানে নিরিবিলি বসে সে তাকে খেতে পারে। হঠাৎ শূন্য আকাশ থেকে একটা প্রকাণ্ড শিক্‌রে তাকে আক্রমণ করলে। হাঁসটা আরো ওপরে উঠলো কিন্তু অক্লান্ত শিক্‌রের দয়া হল না। ক্রমেই তারা ঘুরে ঘুরে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠছে চীৎকার আর প্যাঁক্ প্যাঁক্ শব্দে। হঠাৎ একটা মৃদু অথচ পরিষ্কার প্রতিধ্বনি শোনা গেল—হাঁসের ঝাঁকের সর্দার দলছাড়াটাকে ডাকছে। শুনে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো, কি করছে নিজেই বুঝলে না, সেও সেই ডাকের জবাব দিলে। অমনি মাছটা তার মুখ থেকে খসে গেল। পাতার মত সেটা পড়তে লাগলো। শিক্‌রে মাথা নীচু করে শূন্যে ডুব দিলে। যেই সে নখ দিয়ে মাছটাকে বিঁধতে যাবে অমনি বাতাসের মাঝ দিয়ে একটা গোঁ-গোঁ সোঁ সোঁ শব্দ শোনা গেল। খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে যেমন করে পাথরের চাঁই খসে পড়ে তেমনি করে চোখের নিমেষে এক ঈগল এসে পড়লো। শিক্‌রেকে প্রাণভয়ে ছুটতে দেখে আমার মন খুব খুসি হয়ে উঠলো।

"প্রকাণ্ড পালের মত ঈগলের দুই ডানার তলায় নখগুলো বিদ্যুদ্বেগে বার হয়ে মাছটাকে বিঁধে ফেল্লে, তারপর বাদামী সোণার

উজ্জ্বল বর্মে ঢাকা বাতাসের রাজা উড়ে চলে গেল—তার হাঁটুর ওপরের পালকগুলো বাতাসে ফরফর করতে লাগলো। অনেক দূরে শিকরে তখনো প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

"সে অনেক দূরে চলে যাওয়াতে আমি খুসি হলুম, কারণ যাত্রিপাড়ী যাবার পথের সন্ধান আমাকে করতে হবে, যেখানে মানুষের ফেলা বীজ পেতে পারি। শীঘ্রই কিছু বীজ পাওয়া গেল। বেশ একরকম আহার করে একটা গাছের ওপর বসে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। বিকালের মাঝামাঝি ঘুম ভাঙলে স্থির করলুম, ওপর পানে উড়ে লামাসারিতে আমার বন্ধু ছোট পাখীদের সঙ্গে দেখা করে আসা যাক। যাত্রাপথে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি, কারণ তখন আমি সাবধানে উড়তে পারি। সাধারণত আমি খুব উঁচুতে উঠে যাই, সেখান থেকে নীচে আর দিগন্তে দৃষ্টিপাত করি। বুনোহাঁসের মত লম্বা গলা না থাকলেও, কিছুক্ষণ অন্তর ঘাড় কাত করে দেখে নিই পিছন পানে কেউ আক্রমণ করতে আসছে কি না।

"সূর্যাস্তের সময় পৃথিবীকে আশীর্বাদ করবার জন্যে ঠিক যখন লামারা পূজা-মন্দিরের ধারে দাঁড়াবার উদ্‌যোগ করছিলেন আমি সেই সময় মঠে পৌছলুম। বাসার মধ্যে তিনটি ছানাকে ঘুম পাড়িয়ে আমার পাখী-বন্ধু স্বামী-স্ত্রী সেইখানেই উড়ে বেড়াচ্ছিল। আমাকে তারা অবশ্য সাদর অভ্যর্থনা করলে। সন্ধ্যা-বন্দনার পর সন্ন্যাসীরা আমায় খাওয়ালেন, আর বুড়ো লামা একটা আশীর্বাদের কথা কি বল্লেন, যে-আশীর্বাদ 'অনন্ত করুণা' বলে কে এক জন আমায় দিয়েছেন। তারপর আমি তাঁর হাতের ওপর থেকে উড়ে গেলুম—

বোধ হল একেবারে নির্ভয় হয়েছি। দেহ ও মনের সেই অবস্থায় লামাসারির ছাতের নীচে পাখী-বন্ধুর বাসার পাশেই :আমার বাসার মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম।

"কার্তিক মাসের রাত ঠাণ্ডা। সকালবেলা সন্ন্যাসীরা যখন ঘণ্টা বাজাতেন, তখন আমার পাখী-বন্ধুর ছানাগুলি এদিক ওদিক উড়ে খেলা করতো, আর তাদের বাপ-মা ও আমি সকালের শীত কাটাবার জন্যে উড়তে থাকতুম। তাদের দক্ষিণে যাত্রার আয়োজনে সাহায্য করবার জন্যে সেদিন সেখানেই কাটালুম। তারা লঙ্কাদ্বীপ বা আফ্রিকায় গিয়ে বাসা বেঁধে থাকা স্থির করেছে শুনে আমি অবাক হলুম। তাদের বুঝিয়ে বল্লুম 'সুইফটের' বাসা তৈরী করা মোটেই সহজ নয়। তখন আমার জ্ঞান-পিপাসা মেটাবার জন্যে তারা আমাকে বুঝিয়ে বল্লে কেমন করে তাদের বাস তৈরী করে।"

আট

"সুইফ্‌টের বাসা বাঁধার ওস্তাদি বোঝাবার আগে তার অসুবিধার কথা বলি। তার ঠোঁট ছোট উড়ন্ত পোকা ধরবার উপযোগী। তার মুখ খুব চওড়া, তার দ্বারা উড়তে উড়তে শিকার ধরা সম্ভব হয়েছে। সে আক্রমণ করলে খুব কম পোকামাকড়ই তার মুখের হাঁ এড়িয়ে পালাতে পারে। সে আকারে ভারি ছোট, তাই বেশি ভার তুলতে পারে না। সেই জন্য তার বাসা খুব হালকা জিনিষে তৈরী—যেমন খড়কুটো বা মাঝারি আকারের ছুঁচের মত পাতার ডাঁটি।

"প্রথম যখন 'ওই'-পাখী দেখি তখন তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বিকলাঙ্গ বলে মনে হয়েছিল। তারা বেশ জানে তাদের পা-গুলো অপদার্থ; দাঁড়াবার মত পা তাদের নেই বল্লেই চলে। তার ছোট ছোট পা, বঁড়শির মত আটকাবার জন্যেই যার সৃষ্টি, তার দেহ থেকে সোজা বার হয়েছে। তার হুকের মত নখ দেখলে মনে হয় যেন তা নোয়ানো যায় না, দেহ আর পায়ের পাতার মধ্যে, পায়ের অংশ সামান্য, এজন্যে লম্বা পায়ের অন্য পাখীদের যে একটা দোলা-ভাব থাকে, তা তার নেই। তাই তার দেহ লাফঝাঁপের অনুপযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এই খুঁত খণ্ডে গেছে তার একটি সুবিধা দ্বারা— সে পাথরের রেলিং, শ্বেত পাথরের কার্নিশ বা থামের মাথা আঁকড়ে থাকতে পারে। এমন আর কোন পাখী পারে না। বন্ধু সুইফট্‌কে পালিশ-করা চকচকে দেওয়াল আঁকড়ে থাকতে দেখেছি এমন সহজে, মনে হয় যেন সে খাঁজা কাটা দেওয়াল আঁকড়ে আছে।

"এই সব অসুবিধার জন্যে ঠিক কার্নিশের তলার ঘুলঘুলি সে

তার বাসার জন্যে বেছে নেয়। কিন্তু সেখানে ডিম পাড়তে পারে না। কারণ তা গড়িয়ে পড়ে যাবে। তাই সে ছোট ছোট ওক্‌ড়া খড় আর ঝরা পাতা ধরে বাসায় পাথরের মেঝের ওপর তার থুতু দিয়ে আটকে দেয়। তার বাসা বাঁধার ওস্তাদির এইটিই হল গুপ্ত রহস্য। আশ্চর্য তার থুতু, আসবাব নির্মাতা ছুতারের সেরা আঠার মত তা শুকিয়ে এঁটে যায়। বাসা ঠিক হলে, তারা লম্বা সাদা ডিম পাড়ে। তাদের সমাজে মেয়েরা পায়রা-সমাজের মেয়ের মত স্বাধীন নয়। আমাদের মেয়েরা পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে, কিন্তু মেয়ে-সুইফ্‌ট্‌কে সব সময়েই বেশির ভাগ কাজ করিতে হয়। যেমন, তাদের পুরুষ কখনো ডিমে তা দেয় না; সে কাজ মেয়েকেই করতে হয়। কখনো কখনো পুরুষটির দিনের বেলা স্ত্রীর খাবার নিয়ে আসে, এই পর্যন্ত; তা না হলে যতক্ষণ জেগে থাকে তার সমস্ত সময়টাই অন্য পুরুষ পাখীদের সঙ্গে কাটায়, যখন তাদের স্ত্রীরা ডিমে তা দিতে ব্যস্ত থাকে। বন্ধু সুইফ্‌ট্‌কে বলেছিলুম পায়রার দৃষ্টান্ত দেখে স্ত্রীকে আরো স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, কিন্তু সে কথা সে ঠাট্টা বলেই যেন ধরে নিলে।

"অবশেষে আয়োজন শেষ হল। শরতের এক সুন্দর সকালে তারা পাঁচজন আর আমি দক্ষিণমুখো যাত্রা করলুম—কর্তা সুইফ্‌ট্‌ পথ দেখিয়ে চলো। সরল রেখায় নয়, পূর্বে পশ্চিমে এঁকে বেঁকে চলছি, দিকটা মোটামুটি যদিও দক্ষিণই আছে। নদী হ্রদের ওপর যে সব পোকা আর মশা দেখা যায় সুইফ্‌ট্‌রা তাই খায়। ঘণ্টায় প্রায় পঞ্চাশ মাইল তারা ওড়ে—ছোট পাখীর পক্ষে প্রচণ্ড বেগ। তারা

বনজঙ্গল ভালোবাসে না, কারণ পোকামাকড়ের খোঁজে তাদের দৃষ্টি নীচুপানে যখন থাকে, তখন গাছে ধাক্কা লেগে তাদের ডানা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা। জলের ওপর ফাঁকা জায়গাই তারা পছন্দ করে। কাস্তের মত লম্বা ডানা দিয়ে, ঈগল যেমন দ্রুত শিকারের ওপর এসে পড়ে তেমনি ক্ষিপ্রবেগে তারা বাতাস কেটে চলে। তার চোখ আর মুখের সূক্ষ্মতা কল্পনা করো। জলের ওপর দিয়ে সে যখন ঘুরতে ঘুরতে উড়ে চলে তখন এত সহজে উড়ন্ত পোকামাকড় গ্রাস করতে থাকে যে তার যাত্রাপথ মশামাকড়শূন্য হয়ে যায়—কয়েক মুহূর্ত আগে রোদের মধ্যে যারা ভনভন করে ঘুরছিল।

"এমনি করে কত ছোট নদী, পুকুর, জলাভূমি, পেরিয়ে চল্লুম। কর্তা সুইফটের খাওয়া ও জলপান চটপট শেষ হয়। জলের ওপর উড়তে উড়তে ফোঁটা ফোঁটা জল চেটে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি গিলতে থাকে। সেই জন্যই ঝোপঝাড় গাছপালায় ভর্তি জায়গায় ওড়া, সে ভালবাসে না।

কিন্তু খোলা জায়গায় এত ওড়ার অসুবিধাও আছে। সুইফট্ যখন তাড়াতাড়ি পোকামাকড় খাচ্ছে, তখন ওপর থেকে ছোট শিকরে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। তা যদি ঘটে তবে সে জলে ডুব দিতে পারে না, কারণ তাতে ডুবে মরার সম্ভাবনা। আমার বন্ধুদের ওপর এমন একটি আক্রমণের কথা বলি শোনো। একদিন বিকালে এক প্রকাণ্ড হ্রদের ওপর তারা আহার সংগ্রহ করছে, আমি এদিক ওদিক উড়ে বাচ্ছাগুলোর খবরদারি করছি, এমন সময় একটা ছোট শিকরে হুস্ করে নেমে এল। বাচ্ছাগুলোর রক্ষার

তার আমার ওপর—জীবন সঙ্কট করেও তখনি একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে ঝাঁপ দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে শত্রু আর বাচ্ছাগুলোর মাঝে এসে পড়লুম। ছোট শিকরেটা একটা পায়রার কাছে এত সাহস আশা করেনি, আমার ওজনটাও বিচার করেনি, আমি তার চেয়ে আধ পোয়া আন্দাজ বেশি ভারি। সে নখ দিয়ে আমার লেজে ঘা দেওয়াতে কয়েকটা পালক ছিঁড়ে গেল। তা দেখে সে ভাবলে কিছু বুঝি পেয়েছে, তাই সে শূন্যে চক্রাকারে একটু উড়ে নিলে। আসলে সে কেবল আমার পালক পেয়েছে, এ কথা বোঝবার আগেই বন্ধুরা এক গাছের ছাল আঁকড়ে নিরাপদ হল। ছোট শিকরেটা এমন ক্ষেপে গেল যে সে একটা বড় বাজের মত সরোষে আমার মাথার ওপর এসে পড়লো। যাই হোক, তার দেহ খুবই ছোট, আর তার নখ আরো ছোট; আমি জানতুম, তা দিয়ে আমার পালক আর চামড়া বেশি বেঁধা যাবে না। তাই আমি তার যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিলুম। ডিগবাজী খেয়ে ওপরে উঠলুম—সে-ও পিছু পিছু উঠলো। ধাঁ করে নীচুপানে নামলুম, সে-ও পিছু পিছু নামলো। তারপর আমি উঁচুতে উঠতে লাগলুম, সে-ও তাই করলে; কিন্তু ছোট শিকরে বেশি উঁচুতে উঠতে ভয় পায়—তার পাখা কমজোর হয়ে পড়তে লাগলো। আমি যে-সময়ে দুবার ডানা চালাই সে তখন চালায় একবার। তাকে শ্রান্ত আর নিরাশ দেখে তাকে রীতিমত শিক্ষা দেব স্থির করলুম। যেমনি ভাবা অমনি তা কাজে পরিণত করলুম। হুস্ করে নীচে নামলুম, সে আমার পিছু নিলে নীচে, নীচে, আরো নীচে চলেছি। দুজনের জন্য

আমাদের পানে উঠে আসছে, প্রতি মুহূর্তে উঁচুতে উঠছে, শেষে মনে হল আমার আমার ওসারের চেয়ে বেশি দূরে নয়। তারপর আমি সামনের দিকে কয়েক ইঞ্চি ছুটে গেলুম—একটা তপ্ত হাওয়ার স্রোতে ধাক্কা লাগলো, তা আমাকে ওপর পানে ঠেলে দিলে। তোমরা জানো নীচু জায়গা আর পাহাড়-দেশের উপত্যকায় বাতাস গরম হয়ে ওপরে ঠাণ্ডা জায়গায় ঠেলে উঠতে চায়। হঠাৎ ওপরে ওঠা যখন দরকার হয় তখন আমরা, পাখীরা, এই রকম হাওয়ার স্রোতের সন্ধান করি। এবার আমি তিনবার ডিগবাজী খেলুম, তারপর নীচে চেয়ে দেখি ছোট শিকরেটা জলে ডুবে যাচ্ছে। হাওয়ার স্রোতে সে পৌছতে পারেনি। খুব খানিকটা নাকানি-চোবানি খেয়ে সে বহু কষ্টে উড়ে তীরে পৌছলো, তারপর ঘন-পাতার অন্তরালে তার লজ্জা ঢেকে ফেল্লে। অমনি সুইফট্‌রা যেখানে লুকিয়েছিল, সেখান থেকে বার হয়ে দক্ষিণমুখো উড়ে চল্লো।

"পরদিন কয়েকটি বুনোহাঁসের সঙ্গে দেখা। তাদের গলা আমারই মত রঙিন, কিন্তু তারা বরফের মত সাদা। তারা ছোট নদীর হাঁস—মাছের সন্ধানে পাহাড়ীয়া নদী বেয়ে ভেসে চলা তাদের অভ্যাস। অনেক দূর যাবার পর, তারা জল থেকে উঠে যেখান থেকে যাত্রা করেছিল, সেইখানে উড়ে ফিরে যায়। এমনি করে মাকুর মত একবার আগে, একবার পিছে গিয়ে তারা দিন কাটায়। তাদের ঠোঁট বড়ো হাঁসের চেয়ে চেপ্টা, আর তার ভিতর দিকে খুবরি-কাটা, একবার সে-ঠোঁট মাছের ওপর চেপে বসলে আর তা ফসকে যায় না। তারা ঝিনুক বিশেষ পছন্দ করে বলে মনে হল না,

তার কারণ বোধ হয় হ্রদে মাছ প্রচুর। জায়গাটা তাদের ভালো না, কারণ অনবরত হাঁসের ডানা বাতাস নাড়াচ্ছে আর তার ফলে জলের ওপর সাধারণত যে-সব পোকা ওড়ে তারা পালাচ্ছে। তবুও তারা এ হাঁসগুলোকে দেখে খুসি হল, কারণ তারা পাহাড়িয়া স্রোতকে ভালবাসে এবং তার মধ্যেই বাস করে। অধিকাংশ হাঁস স্থির জল পছন্দ করে, সুইফ্‌টেরা তা করে না।

. "এখানকার পেঁচা ও অন্যান্য নিশাচর খুনেদের সম্বন্ধে এই হাঁসেরাই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিল। তাই আমরা এমন সব ছোট জায়গায় লুকিয়ে থাকতুম যার মধ্যে পেঁচার ঢোকা সম্ভব নয়। সুইফ্‌টদের থাকবার মত ছোট গর্ত গাছে পাওয়া সহজ, কিন্তু আমি বাইরে থাকাই স্থির করলুম। রাত হয়ে এল। শীগ্‌গিরই আমার চোখদুটো অকেজো হয়ে গেল—তা দিয়ে আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার থাক থাক কালো কাপড়ের মত চোখের ওপর চেপে বসেছে। আমাদের জাতের ঠাকুরের কাছে আপনাকে সঁপে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু পেঁচাদের হুত্‌রুম-ভুত্‌রুমের মাঝে কার সাধ্য ঘুমোয়? সারারাত ভয় আমার ওপর ভর করে রইলো। এমন ঘণ্টা কাটেনা যার মধ্যে কোনো পাখীর যন্ত্রণাকাতর চীৎকার না শোনা যায়। পেঁচাগুলোও সফলতার আনন্দে চেঁচাচ্ছে। মাঝে মাঝে পাখীরা মরণভয়ে চীৎকার করে উঠছে, তারপর পেঁচার খপ্পরে মারা পড়ছে। আমার চোখ যদিও বন্ধ, আমার কান বেশ বুঝছে কী হত্যাকাণ্ড চলছে। একটা কাক চেঁচিয়ে উঠলো, তারপর আর একটা, তারপর আর একটা। প্রায় এক ঝাঁক

আতঙ্কে উড়ে গাছের গায়ে ধাক্কা লেগে চূর্ণ হয়ে গেল। পেঁচার ঠোঁট আর নখের ঘায়ে ছিন্নভিন্ন বিদীর্ণ হওয়ার চেয়ে এ রকম মরণ ভালো। শীঘ্রই নেউলের গন্ধ নাকে এল, আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম, মনে হল মরণের আর দেরী নেই। একেবারে মরিয়া হয়ে চোখ মেলে চাইলুম। সব জিনিসের ওপর একটা ম্লান সাদা আলো। আমার সামনে হাত চারেক তফাতে এক নেউল। আমি ওপর পানে উড়লুম। যদিও তাতে পেঁচার আক্রমণে মারা যাবার বিপদ বাড়লো। আর বাস্তবিকই একটা পেঁচা চেঁচাতে চেঁচাতে এসে হাজির হল। তার পিছু পিছু আরো দুটো এসে উপস্থিত। তাদের ডানার শব্দ কানে এল। শব্দ থেকে বুঝ্‌তে পারলুম, আমরা জলের ওপর দিয়ে উড়ছি, কারণ আমাদের পালকের সামান্য কাঁপনেরও প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। কোনো দিকে বেশি দূর উড়তে পারি না, কারণ এক সময়ে চার হাতের বেশি নজরে পড়ে না, তাই শূন্যে বাতাসের স্রোত হাতড়ে বেড়াতে লাগলুম—যে স্রোত নদীর বাতাস শুষে ঝুঁকে-পড়া ডালের ওপর টেনে নেয়। পেঁচাগুলো প্রায় ঘাড়ে এসে পড়লো—এখন কি উপায়? আমি ডিগবাজি খেয়ে গোল হয়ে উড়তে লাগলুম। পেঁচাগুলো সঙ্গ ছাড়ে না। আরো উঁচুতে উঠলুম। চাঁদের আলো আমার ডানা বেয়ে জলের মত ঝরে ঝরে পড়ছে। এবার আর একটু পরিষ্কার দেখতে পেলুম, আমার সাহস ফিরে এল। কিন্তু শত্রু নিরস্ত হল না। তারাও ওপরে উঠলো, আরো আলো চোখে এসে পড়াতে, তাদের দৃষ্টিশক্তি কতকটা লোপ পেল। হঠাৎ তাদের মধ্যে দুটো আমার পানে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি সাঁ করে' ওপরে উঠে গেলুম।

পেঁচাদের টিপ্‌ ফস্‌কে গেল—আর তারা পরস্পরের ঘাড়ে এসে পড়লো। থাবায় থাবায় জড়িয়ে গেল, বাতাসে অসহায়ভাবে তাদের ডানা ঝটপট ঝটপট করছে, পিশাচের মত চেঁচাতে চেঁচাতে তারা নদীর ধারে নলখাগড়ার ঝোপের মাঝে পড়ে গেল।

"এবার সন্তর্পণে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলুম, উষার পানে উড়ে এসেছি, চাঁদের দিকে নয়। আমার ভয়বিহ্বল চোখ ঠিক দেখেনি। কিন্তু আশপাশে পেঁচা আর নেই; তারা বাড়ন্ত রোদ থেকে লুকোবার জায়গা খুঁজতে সুরু করেছে। নিরাপদ মনে হলেও লম্বা গাছের বড়ো বড়ো ছায়া থেকে তফাতে রইলুম; কারণ সেখানে এখনো হয়তো পেঁচা থাকতে পারে। গাছের ডগায় একটা সরু ডালের ওপর আমি বসে রইলুম, সূর্যের কিরণ প্রথমে সেখানেই তীরের মত এসে বিঁধলো—গাছের মাথাটা দেখতে হল যেন সোনার ছাতা—সেই সোনা আবার দুলছে। আস্তে আস্তে আলো আরো নীচে ছড়িয়ে পড়ে শেষে সেই জলধারার বুকে বেঁজির চোখের রং ধরে কাঁপতে লাগলো।

"ঠিক সেই সময় নদীতীরে একটা ভয়ানক দৃশ্য দেখলুম। বড়ো বড়ো দুই কাক, কয়লার চেয়ে কালো, একটা চোখ-মিটমিটে অসহায় পেঁচাকে ঠোকরাচ্ছে। পেঁচাটা নল-খাগড়ার ঝোপে ধরা পড়েছে। এখন রোদ ওঠায় সে চোখ মেলতে পারছে না। অবশ্য রাতে অনেক কাক মারা পড়েছে, এবার কাকেরা সেই অত্যাচারের শোধ তুলছে। কিন্তু তারা দুজনে মিলে বন্দী পেঁচাটাকে মারছে—সে-দৃশ্য অসহ্য। তাই খুনেদের কাছ থেকে উড়ে গিয়ে বন্ধু সুইফ্‌টদের খোঁজে গেলুম।

আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা তাদের বল্লুম। সুইফ্‌ট্‌-দম্পতি বল্লে, তারাও সারারাত ভয়ানক যন্ত্রণার চীৎকার শুনে শুনে ঘুমতে পারেনি। কর্ত্তা-সুইফ্‌ট্‌ জিজ্ঞাসা করলে, বাইরে সমস্ত নিরাপদ ত? আমি বল্লুম, তাই মনে হয়। তখন সকলে বাইরে এসে দেখি বেচারা পেঁচা সেই ঝোপের মধ্যে মরে পড়ে আছে।

"কী আশ্চর্য্য! সেদিন সকালে ছোট নদীর ওপর একটিও হাঁস দেখতে পেলুম না। বেশ বোঝা গেল তারা ভোররাতে দক্ষিণমুখে উড়ে গেছে, আমরাও তাই করা স্থির করলুম। আমাদের পথে অন্য যে-সব পাখী যাবে তাদের দলে আমরা ভিড়বো না। কারণ, দেশান্তর যাবার সময়, যেখানেই পায়রা, বিলমোরগ বা অন্য পাখীর ঝাঁক যায়, তাদের পিছু পিছু পেঁচা, শিকরে, ঈগল প্রভৃতি তাদের শত্রুরাও ধাওয়া করে। যে-সব ভয়ানক দৃশ্য দেখেছি তা এড়িয়ে বিপদকে দূরে রাখার জন্যে আমরা পূর্ব্বদিকে সারাদিন উড়ে সিকিম গ্রামে গিয়ে বিশ্রাম করলুম। পরদিন দুপুর পর্য্যন্ত দক্ষিণমুখো উড়ে আবার পূবে গেলুম। এমনি ঘুরপথে যাওয়ার সময় অনেক কাটলো বটে, কিন্তু কতটা হাঙ্গাম যে কমলো তা বলা যায় না।

"একবার ঝড়ের মাঝে পড়ে এক হ্রদের দেশে গিয়ে পড়ি, সেখানে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাই। আমি গাছের ওপর বসে ছিলুম। নীচে দেখি অনেকগুলো পোষা পাতিহাঁস মুখে এক একটি মাছ ধরে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কেউ তা খাচ্ছে না। ইতিপূর্ব্বে কখনো হাঁসকে মাছ খাবার লোভ সম্বরণ করতে দেখিনি, তাই ব্যাপার দেখবার জন্যে সুইফ্‌ট্‌দের ডাকলুম। কয়েকটা গাছের ছাল আঁকড়ে ধরে

তারা হাঁসগুলোর পানে চেয়ে রইলো, কিন্তু তারা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলে না। এদের হ'ল কি? ক্ষণকালের মধ্যেই একখানা নৌকা দেখা গেল—চেপ্টা-মুখো হলুদবর্ণ দুটো লোক সে-নৌকা বাইছে। তাদের দেখে পাতিহাঁসগুলো তাড়াতাড়ি জল কেটে নৌকার দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে পৌঁছে লাফিয়ে নৌকার ওপর উঠলো, তারপর বল্লে হয় ত বিশ্বাস করবে না—মস্ত এক মাছের ঝুড়ির মধ্যে তাদের শিকার ফেলে দিয়ে হ্রদের মধ্যে আবার ঝাঁপিয়ে পড়লো আরো মাছ ধরার জন্যে। আরো প্রায় দু'ঘণ্টা এমনি চল্লো। দেখে মনে হল এই তিব্বতীবর্ম্মী জেলেরা কখনো জাল ফেলে না। তাদের পোষা হাঁসের গলায় খুব কসে সুতো বাঁধে—প্রায় দম বন্ধ করার মত; তারপর মাছ ধরবার জন্যে তাদের হ্রদে নিয়ে আসে। হাঁসগুলো যা ধরে সমস্তই তাদের মানুষ-প্রভুর কাছে নিয়ে যায়। যাই হোক জেলেদের ঝুড়ি ভর্ত্তি হয়ে গেলে হাঁসের গলার সুতো তারা খুলে দিলে। তখন তারা হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেট ভরে মাছ খেতে লাগলো।

"এবার আমরা কিছুকালের জন্যে হ্রদ থেকে অনেক দূরে শস্য-ক্ষেতের সন্ধানে উড়ে গেলুম। সেখানে নতুন-কাটা শস্যের চারিদিকে পোকা উড়ছিল, তাদের ওপর সুইফ্‌টেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমিও পেট ভরে শস্য খেতে লাগলুম—কিন্তু পোকা মাকড় নয়। ধানের ক্ষেতের আলের ওপর বসে বসে শুনতে পেলুম, কে যেন কি ঠুকছে। মনে হল যেন কোনো পাখী তার ঠোঁট দিয়ে ফলের বীচি ঠুকরে ঠুকরে তার ভিতরের শাঁস বার করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু যেদিক

থেকে শব্দ আসছিল সেই দিকে এগিয়ে দেখি সেটি একটি হিমালয়ের পাখী, ফলের বীচি ফাটাবার চেষ্টা করছে না—আস্তে আস্তে একটা গেঁড়ি চলছে, তাকেই সে ঠোকরাচ্ছে। টিক্-ট্যাক্; টিক্-ট্যাক্—ট্যাক্! সে ঘা দিতেই থাকলো, শেষে গেঁড়িটি অবশ অচল হয়ে পড়লো। তখন ছোট পাখীটা মাথা তুলে চারিদিকে চেয়ে দেখলে, সামনের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, ডানা মেলে ধরলে, তাড়াতাড়ি টিপ্ করে আর তিনবার ঘা দিলে—ট্যাক্, ট্যাক্, ট্যাক্! খোলা ফেটে একটি খাসা গেঁড়ি বার হয়ে পড়লো। সে সেটিকে ঠোঁট দিয়ে তুলে ধরলে, তা থেকে একটু একটু রক্ত বার হচ্ছে। বেশি ঘা করাব দরুণ ঠোঁটের কোণা চিরে গেছে। গেঁড়িটিকে ঠিক করে কামড়ে ধরে সে উড়ে একটা গাছের মধ্যে অদৃশ্য হল; যেখানে তার সঙ্গিনী সন্ধ্যার আহারের অপেক্ষা কবছিল।

"সিকিমেব শস্যক্ষেতের মাঝ দিয়ে যাবার সময় জঙ্গলে মানুষ ফাঁদ পেতে ময়ূর ধরছে দেখলুম। ময়ূরেরা দক্ষিণের তপ্ত জলাভূমিতে আহার ও উত্তাপের সন্ধানে আসে, যখন উত্তরে, তাদের খাদ্য, সাপ ও অন্যান্য জীবেরা, শীতের প্রকোপে গর্ত্তে গিয়ে ঢোকে।

"ময়ূর আর বাঘ পরস্পরকে তারিফ করে। ময়ূর বাঘের চামড়া দেখতে ভালবাসে, আর বাঘ ময়ূরের পেখমের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে। জলের ডোবায় গিয়ে কখনো কখনো বাঘ গাছের ডালে ময়ূরের পেখমের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর ময়ূর তার গলা বাড়ায় আঁজিকাটা চামড়ার সৌন্দর্য্য চোখ দিয়ে পান করার জন্যে। এইবার সেখানে মানুষ এসে পৌঁছলো—সেই চিরকেলে অত্যাচারী।

সে একদিন একটুকরো কাপড় নিয়ে হাজির হল—ঠিক বাঘছালের মত তার রং। তা দেখে কোনো পাখী বুঝবে না যে সেটি আসল বাঘ নয়। তারপর সে কাছেই একটা গাছের ডালে ফাঁদ পেতে গা ঢাকা দিলে। সেই আঁকা কাপড়খানার গন্ধ শুঁকে আমি বলতে পারতুম যে সেটা বাঘ নয়, কিন্তু ময়ূরের গন্ধ বোঝবার ক্ষমতা একরকম নেই বল্লেও চলে। তাদের চোখই তাদের শত্রুতা করে। তাই কয়েকঘণ্টার মধ্যেই একজোড়া ময়ূর এসে একটা গাছের ডগা থেকে সেই নকল বাঘকে একদৃষ্টে দেখতে লাগলো, এবং দেখতে দেখতে ক্রমে নামতে লাগলো। তারা নিজেদের এই বুঝিয়ে ভোলালে যে বাঘ ঘুমচ্ছে। সেই ভুল বিশ্বাসে সাহসী হয়ে তারা খুব কাছে এল, আর ফাঁদের কাছের ডালে এসে দাঁড়ালো। তারপর ফাঁদের মধ্যে পা দিতে বেশিক্ষণ লাগলো না, কিন্তু একই ফাঁদে দুজনে কি করে পড়লো, বুঝতে পারি না। ধরা পড়েই তারা হতাশ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। পাখীধরা তখন বার হয়ে এল। সে এসেই তাদের ওপর আর এক চালাকি খেল্লে। দুটো বড়ো বড়ো কালো ক্যাম্বিসের টুপি ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে প্রত্যেক ময়ূরের মাথায় একটা করে আটকে দিয়ে তাদের চোখ ঢেকে ফেল্লে। চোখ বন্ধ করে দিলে পাখীরা বেশি বাধা দেয় না। লোকটা এবার তাদের পা বাঁধলে, যাতে তারা হাঁটতে না পারে; তারপর সে তার বাঁকের দুই ধারে দুই পাখীকে ঝুলিয়ে নিলে। বাঁকের মাঝখানটা ধরে উঁচু করে কাঁধের ওপর রাখলে, তারপর সামনে আর পিছনে ময়ূরের দীর্ঘ পুচ্ছ রামধনুর নির্ঝরের মত দুলতে লাগলো।

"এইখানে আমার গল্পের শেষ। পরদিন সুইফ্‌টুদের কাছে বিদায় নিলুম। তারা আরো দক্ষিণে গেল, আমি খুসিমনে বাড়ি ফিরলুম—জ্ঞানের সঙ্গে আমি দুঃখও নিয়ে এলুম। এবার," চিত্রগ্রীব জানতে চাইলে, "আমাকে বুঝিয়ে দাও—পাখী আর জীবজন্তু পরস্পরকে এত ব্যথা দেয় কেন, এত হত্যা করে কেন? তোমরা মানুষেরা সবাই পরস্পরকে এমন আঘাত করো বলে ত মনে হয় না। করো না কি? কিন্তু পাখী আর জন্তু তাই করে। ভাবলে ভারি দুঃখ হয়।"



দ্বিতীয় খণ্ড

এক

সহরে ফিরে আসার পর ইউরোপের কোথাও একটা ভাবী যুদ্ধের জোর গুজব রটলো। শীতের আর দেরী নাই, আমি স্থির করলুম চিত্রগ্রীবকে এমন শিক্ষা দেব, যাতে সে দরকার হলে ইংরেজের যুদ্ধবিভাগে সংবাদবাহীর কাজে লাগতে পারে। উত্তর পূর্ব্ব হিমালয়ের আবহাওয়ায় সে অভ্যস্ত, তাই ইউরোপের যে কোনো দেশে সৈন্যদলের সংবাদ বহনের কাজ খুব ভালো রকমই পারবে। এখনো বেতার টেলিগ্রাফ আর রেডিওর সাহায্য সত্বেও কোনো সৈন্যদল সংবাদবাহী পায়রার সাহায্য ছাড়তে পারে না। এই গল্পটি অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্তই তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

যুদ্ধের কাজ শেখাবার জন্য আমি নিজের প্রণালী অবলম্বন করলুম। ঘণ্ডালুও তা অনুমোদন করলে। বলা উচিৎ, সে আমাদের সঙ্গে সহরে এসেছিল। আমাদের বাড়ীতে দিন দুই তিন থেকে সে চলে যাওয়া স্থির করলে। সে বল্লে, "এ সহর অসহ্য। কোনো সহরই আমার পছন্দ নয়, কিন্তু এই সহর তার ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রাম আর হাওয়া গাড়ী (মোটর গাড়ী) থাকায় ভয়াবহ। এ সহরের ধুলো গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে না পারি ত আমি কাপুরুষ। বনে বাঘ দেখে ভয় পাই না, কিন্তু মোটর সম্বন্ধে সে কথা বলতে পারি কই? আজ কালকার সহরের রাস্তা পার হবার সময় এক মিনিটে জীবন যতবার বিপন্ন হয়; খুব ভয়ানক জঙ্গলেও দিনে ততবার হয় না। আমি চল্লুম—বন নীরবতায় ঢাকা, সেখানে বাতাসে ধুলাও

নেই, দুর্গন্ধও নেই, আর নীলকান্ত মণির মত আকাশ টেলিগ্রাফের থাম আর তার দিয়ে ছাদা হয়নি। কলকারখানার ভোঁ-ভাঁর বদলে সেখানে শুনতে পাব পাখীর গান, চোর ডাকাতের বদলে দেখা পাব বাঘ আর পান্থারের। বিদায়!"

কিন্তু যাবার আগে তার সাহায্যে আরো গোটা চল্লিশ পত্রবাহী ও লোটন পায়রা কিনে ফেল্লুম। এই দুই রকম পায়রা বেছে নেবার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারো। এদের প্রতি আমার যে বিশেষ কোনো অনুরাগ আছে তা নয়, তবে লক্কা, মুখ্‌খি ও অন্যান্য পায়রা তেমন কোন কাজে লাগে না—দেখতে বেশ, এই পর্যন্ত। আমাদের বাড়ীতেও এ রকম পায়রা কিছু কিছু ছিল, কিন্তু পত্রবাহী পায়রার সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাখা এত মুস্কিল যে শেষ পর্য্যন্ত যারা আসল উড়নদার তাদের ওপরই আমার ঝোঁক পড়লো।

পায়রাগুলোকে পোষ মানাবার জন্য যা করা দরকার, সব আরম্ভ করে দিলুম। প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাদের ডানা বেঁধে রাখতে হল, যাতে তারা আমাদের ছাতের বার না হতে পারে। পায়রার ডানা বাঁধা ব্যাপারটি—যার ফলে সে উড়তে পারে না—অতি সূক্ষ্ম। একটা সুতো নিয়ে তার একদিক একটা পালকের উপর দিয়ে নিয়ে আবার গোঁড়া ঘেঁসে পরের পালকের নীচে দিয়ে, তার পরের পালকের উপর দিয়ে, এমনি করে সমস্ত ডানাটাই বাঁধা পড়ে। তারপর সুতোর অপরদিক ঠিক সেই ভাবেই প্রথম পালকের নীচে দিয়ে দ্বিতীয় পালকের উপর দিয়ে ডানার শেষ পর্য্যন্ত চালিয়ে সুতোর দুই দিক বেঁধে দেওয়া হয়। অনেকটা রিপু করার মত। এইরূপ

বন্দীত্বে কোন যন্ত্রণা নাই। পায়রাটি উড়তে না পারলেও, ডানা মেলতে বা ডানা ঝটপট করতে পারে। ডানা ছড়িয়ে ঠোঁট দিয়ে তা টিপে নিতে পারে। ডানা বাঁধার পর নতুন পায়রাগুলোকে ছাতের ভিন্ন ভিন্ন কোণে ছেড়ে দিতুম, যাতে তারা চুপ করে বসে তাদের আশপাশ লক্ষ্য করতে পারে। এই ভাবে অন্তত পনেরো দিন কাটানো চাই।

চিত্রগ্রীবের যখন ডানা বাঁধা হয় তখন সে এক চালাকি করেছিল—সেই কথা বলি। অঘ্রাণ মাসের গোড়ায় তাকে বিক্রি করে দিলুম। তার ডানার বাঁধন খোলার পর সে আমার কাছে ফিরে আসে কি না তাই দেখাই উদ্দেশ্য ছিল।

ঠিক দু'দিন পরে যে লোকটি চিত্রগ্রীবকে কিনেছিল, সে এসে বল্লে, চিত্রগ্রীব পালিয়েছে।

"কি করে?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

"জানি না। কিন্তু তাকে বাড়ীতে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তার ডানা বেঁধে দিয়েছিলে? সে কি উড়তে পারতো?" আমি প্রশ্ন করলুম।

"তার ডানা ত বাঁধা হয়েছিল", সে উত্তর দিলে।

শুনে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠলো। আমি বল্লুম, ওহে বোকচন্দর গাধারাম, আমার কাছে ছুটে না এসে তোমার বাড়ীর কাছে খোঁজ করলে না কেন? বুঝতে পারছো না যে সে ওড়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ডানা বাঁধা থাকায় তোমার হাতের ওপর থেকে পড়ে গেছে? এতক্ষণে বেড়াল এসে তাকে সাবাড় করে দিয়েছে! ওঃ

পায়রাটা বেঘোরে মারা গেল! এমন একটা খাসা হরকরা পায়রাকে তুমিই খুন করলে!"

আমার কথায় লোকটা বিষম ভড়কে গেল, শেষে চিত্রগ্রীবের খোঁজ করার জন্য কাকুতি-মিনতি জুড়ে দিলে। আমার প্রথম চিন্তা হল বেচারাকে বেড়ালের মুখ থেকে রক্ষা করা। সারা বিকাল কেটে গেল, কিন্তু বৃথায়। কোনো এক ঘেয়ো বেড়ালের খপ্পরে তাকে পাবার আশায় বারো ঘণ্টায় এত সব নোংরা গলিখুঁজি সন্ধান করলুম, যে তেমন আমার সারা জীবনে কখনো করিনি। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না, সেদিন অনেক রাতে বাড়ী ফিরে বিষম বকুনি খেয়ে হতাশ-মনে শুতে গেলুম।

মা আমার মনের অবস্থা বুঝেছিলেন। মনে অশান্তি আর দুঃখ নিয়ে ঘুমুই তাঁর ইচ্ছা হল না। তিনি বল্লেন, "তোমার পায়রা নিরাপদে আছে। শান্ত হয়ে ঘুমোও!"

"কেন মা?"

তিনি বল্লেন, "স্থির হলে তোমার ভাবনাও শান্ত হবে, তাতে তোমারি সুবিধা। তুমি যদি শান্ত হও তবে তোমার শান্তিতে সে-ও শান্তি পাবে। আর সে শান্তি পেলে তার মনের কলও ঠিক চলবে। আর তুমি ত জানই বাছা চিত্রগ্রীবের মন কত তীক্ষ্ণ। শান্ত মনে কাজ আরম্ভ করলে সকল বাধা অতিক্রম করে সে নিরাপদে বাড়ী পৌছতে পারবে। এস আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে নিজেরা শান্ত হই।" তখন সেই নিশুতি রাতে আধঘণ্টা স্থির হয়ে বসে বলতে

লাগলুম আমি শান্ত! জগতে যা কিছু আছে সব শান্ত! ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি!

ঘুমিয়ে পড়ার সময় মা বল্লেন, "এখন আর তুমি কোনো দুঃস্বপ্ন দেখবে না। ভগবানের শান্তি আর করুণা তোমার মধ্যে জেগেছে, রাতের বিশ্রাম তোমার সফল হবে। ঘুমোও?"

তাই হল। সকালে এগারোটা নাগাদ চিত্রগ্রীব আকাশে দেখা দিল। অনেক উঁচু দিয়ে সে আসছে। ডানাদুটোকে কি করে খুল্লে তারই ভাষায় তোমাদের বলবো।

আমাদের ছাতে বসে চিত্রগ্রীব বলতে লাগলো, "হে অনেক-ভাষায়-পণ্ডিত, লোকটার বাড়িতে একদিনের বেশি টেঁকতে পারলুম না। সে আমাকে পোকা-ভরা খাবার আর বাসি নোংরা জল খেতে দিলে। হাজার হোক আমারও ত একটা প্রাণ আছে, আমি ত আর ইট-পাথর বা খোলামকুচি নই? তা ছাড়া, দুর্গন্ধ মাছ-ধরা সুতো দিয়ে সে আমার ডানা বেঁধে দিলে। এমন লোকের সঙ্গে আমি থাকবো? রামঃ! তাই যেই সে আমাকে তার বাড়ির সাদা ছাতের ওপর রেখে নীচে নেমেছে, অমনি পাখা ঝটপটিয়ে উড়লুম! পাখা ভারী ঠেকতে লাগলো, উড়তে কষ্ট হতে লাগলো। তাই পাশের গলির এক দোকানের তোলা-ঝাঁপের ওপর গিয়ে পড়লুম। সেখানে বসে বসে সাহায্যের অপেক্ষা করতে লাগলুম। দেখলুম কয়েকটা 'সুইফ্‌ট' পাখী উড়ে গেল; তাদের ডাকলুম, কিন্তু তারা ত আমার বন্ধু নয় যে আসবে! একটা বনের পায়রা দেখলুম; তাকেও ডাকলুম, সে-ও কোনো জবাব দিলে না। ঠিক সেই সময় দেখি একটা কালো বেড়াল

আমার দিকে এগিয়ে আসছে। একেবারে চারপেয়ে যম! যতই সে কাছে আসছে, তার পোখরাজের মত চোখ লাল দেখাচ্ছে। গুড়ি মেরে সে লাফাবার উপক্রম করলে। আমিও লাফিয়ে উঠলুম—তার মাথা ছাড়িয়ে ঝাঁপের প্রায় পাঁচ ফুট ওপরে কার্ণিসের ওপর গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে এক 'সুইফ্‌ট' বাসা বেঁধেছিল। খুব কঠিন হলেও, কালো মূর্তিটা বিদায় না হওয়া পর্যন্ত সেই জায়গা আঁকড়ে রইলুম। তারপর আবার লাফ দিলুম। আমার চারপাঁচ ফুট ওপরেই ছাত। সেখানে গিয়ে বসলুম। কিন্তু আমার ডানা টাটিয়ে উঠলো। ব্যথা আরাম করবার জন্যে আমার পালকের গোড়া টিপতে লাগলুম, আমার ঠোঁট একটি একটি করে পালক টিপে টিপে ঘসতে লাগলো, আর অমনি কি একটা খুলে পড়তে লাগলো। মাছ-ধরা-সুতোর ফাঁস থেকে একটি ছোট পালক টিপে টিপে বার করে ফেল্লুম—তাতে কী দুর্গন্ধ! পরের পালকটাও ঘসতে লাগলুম আর চাপতে লাগলুম, সেটাও মুক্ত হল! ওঃ কী আনন্দ! শীগ্‌গিরই সমস্ত পাখার বন্ধন মোচন হল। ঠিক সেই সময় কালো বেড়াল আবার ছাতে দেখা দিলে, কিন্তু এখন আমি দশ ফুট আন্দাজ উড়তে পারি—একটা উঁচু বাড়ির কার্নিসে গিয়ে পৌঁছলুম, সেখানে বসার বেশ সুবিধা। সেখান থেকে দুষমন বেড়ালটাকে লক্ষ্য করতে লাগলুম। সে গুড়ি মেরে লাফিয়ে পড়লো সেই মাছধরা সুতোর ওপর—আমার ডানা থেকে সেই মাত্র সেটাকে ঝেড়ে ফেলেছি। তা থেকে একটা নতুন ধারণা জন্মালো; মাছধরা সুতোর গন্ধেই সে আকৃষ্ট হয়েছিল—আমার দ্বারা নয়। যে

সুতো দিয়ে অন্য ডানাটা বাঁধা ছিল তখনি সেটাকে কামড়াতে আর চাপতে লাগলুম। অর্দ্ধেক পালক ছাড়িয়েছি এমন সময় রাত হয়ে এল, তারপর ডানা থেকে যখন সেই দুর্গন্ধ বাঁধের শেষ খুলে ফেল্লুম, তখন বাধ্য হয়েই সকালের অপেক্ষায় থাকতে হল বাড়ি ফেরার জন্যে; কারণ ভোর রাতে পেঁচা ওড়ে, তারপরে বার হয় শিকারে—নিরাপদে শূন্যপথে যাওয়ার আমার ইচ্ছে। এতক্ষণে বাড়ি পৌছেচি—ভারি ক্ষিদে আর তেষ্টা পেয়েছে!"

নতুন পায়রাগুলোকে নিয়ে আমার প্রথম কাজ হল তাদের খাবার আর টাটকা জল দেওয়া। যে-জলে তারা স্নান করতো সে-জল তাদের কখনো খেতে দিতাম না। চিত্রগ্রীবের ডানায় আঁষ্টে গন্ধ, তাই আমি তাকে থাকবার আলাদা জায়গা দিলুম। আরো তিন দিন পরে তিনবার ভালো করে স্নান করে তবে সে ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হল। এখানে বলা দরকার, চিত্রগ্রীবকে যে কিনেছিল, বাবার ইচ্ছায় তাকে টাকা ফেরত দেওয়া হল। সত্যকথা বলতে কি তখন টাকা ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু এখন মনে হয় বাবার কথা শুনে ঠিকই করেছিলুম। দু'হপ্তা পরে, নতুন পায়রাগুলোর ডানা খুলে দেবার আগে, আমি তাদের ভালবাসা পাবার জন্য ঘুস দিতুম। প্রতিদিন সকালে কয়েকটা ভুট্টা আর মটরদানা ঘিয়ের মধ্যে রেখে দিই। সারাদিন ঘিয়ে ভেজার পর প্রত্যেক পায়রাকে সেই দানা ডজন খানেক করে দিতুম। সেই সুখাদ্যের লোভ এমন হল যে দু'দিন না যেতেই বেলা পাঁচটার মধ্যে আমার কাছে এসে সেই ঘিয়ে-জরানো মটর চাওয়া তাদের অভ্যাস হয়ে উঠলো। তিন দিন পরে আমি

একটু কায়দা করে পৌনে পাঁচটার সময় তাদের ডানা খুলে দিলুম। মুক্তি পেয়েই তারা উড়লো—কিন্তু ফুর্তির প্রথম ধাক্কা কাটার পরই তারা আবার ছাতের ওপর নেমে এল ঘিয়ে-জরানো সেই মটরের লোভে! পেট ভরিয়ে খাতির আদায় করা দুঃখের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে সংসারে অনেক মানুষ এ বিষয়ে পায়রারই মতন!



দুই

দিন দিন নতুন পায়রাগুলো বাড়ি থেকে ক্রমেই দূরে দূরে ওড়া শিখতে লাগলো। একমাস পরে তাদের পঁচিশ ক্রোশ দূরে নিয়ে ছেড়ে দিলুম। মনে হল কেবল দুটি তাদের আগের মনিবের কাছে ফিরে গেছে, তা ছাড়া সকলেই চিত্রগ্রীবের চালনায় আমার কাছে ফিরে এল।

পায়রাদের একছত্র নায়ক কে হবে তা সহজে স্থির হয়নি। বস্তুত চিত্রগ্রীব আর দুজন নতুন পুরুষ হীরা আর জহরের সঙ্গে একটা বিষম লড়াইয়ের পর তা স্থির হয়। জহর একটি খাঁটি কালো লোটন-পায়রা। তার পালক পান্থারের লোমের মত চকচকে। সে ভালমানুষ—ভীষণ নয়; তবুও চিত্রগ্রীবই পায়রার ঝাঁকের চালক হবে, এ ব্যবস্থায় সে রাজি হল না। হরকরা পায়রাগুলো সাধারণত বেজায় ঝগড়াটে আর চালবাজ। আমার ছাতের ওপর তাদের পুরুষগুলো এমনভাবে চলাফেরা করতো, এমন কথাবার্তা কইতো যেন এক একটি ক্ষুদে নবাব। চিত্রগ্রীব, হীরা আর জহর এই তিনটি ছাড়া আরো দেমাকে পুরুষ-পায়রা ছিল বটে, কিন্তু তারা তিন জনের কারো না কারো কাছে হেরেছে। এখন সমস্ত ঝাঁকের সরদারীর ব্যাপারটা লড়াই করে ঠিক করা দরকার হয়ে পড়লো।

একদিন দেখা গেল হীরা ডানা মাজতে মাজতে জহরের বউয়ের কাছে ঢং করে বকছে। খাসা মেয়ে সেই বউটি—রং মিশকালো, আর চোখদুটি চুনির মত লাল টুকটুকে। ব্যাপার তখনো প্রায় কিছুই

গড়ায়নি, এমন সময় কোথা থেকে জহর ছুটে এসে হীরার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাগে উন্মত্ত হয়ে হীরা দানোর মত যুঝতে লাগলো। ঠোঁটে ঠোঁট, পায়ে পা, আর ডানায় ডানা আটকে লড়াই চল্লো। আশপাশ থেকে অন্য সব পায়রা উড়ে পালালো। চিত্রগ্রীব টেনিস-ম্যাচের 'আমপায়ার'এর মত ধীরভাবে উঁচুতে বসে রইলো। শেষে, বার ছয়েক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর হীরার জয় হল। তখন দেমাকে সে ফেটে পড়বার উপক্রম—রোঁয়া ফুলিয়ে তুলে জহরের বউয়ের কাছে গিয়ে অমনি হাজির হল, যেন বলতে চায়—মহাশয়া, আপনার স্বামী একটি কাপুরুষ!' আমি কেমন বাহাদুর দেখুন—বক্-বকুম্-কুম্‌কুম্! তার পানে ঘৃণার একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে ডানা ছটফটিয়ে মেয়েটি বাসার মধ্যে স্বামীর কাছে চলে গেল। হীরার ভাবটা কখনো মনমরা, কখনো বেজার বেজার, শেষে হঠাৎ রাগের চোটে সে চিত্রগ্রীবের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রমণ—প্রথম ধাক্কাতেই তার প্রায় কুপোকাত হবার উপক্রম। হীরার ঠোঁটের ঠোকর আর ডানার ঝাপটে চিত্রগ্রীবের মাথা ঘুরে গেল, আর দাঁড়াতে না পেরে সে ছুটে পালালো—উন্মাদ তাকে তাড়া করলে। চরকির মত গোল হয়ে তারা ছুটতে লাগলো, কে যে কাকে তাড়া করছে দেখা যায় না। এত জোরে তারা ছুটছিল যে দেখতেই পেলুম না কখন তারা থেমে কামড়া-কামড়ি থাবড়া-থাবড়ি সুরু করে দিয়েছে। ডানায় ডানায় ঠোকাঠুকির ফটাফট শব্দের মাঝে চারিদিকে পালক উড়তে আরম্ভ হল। হঠাৎ ঠোঁটে

ঠোঁটে নখে নখে আটকে তারা মেঝের ওপর বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগলো—দুই পাখী যেন উন্মত্ত ক্রোধের একটি অবতার পরিণত হয়েছে! প্রতিদ্বন্দ্বীর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে চিত্রগ্রীব শূন্যে উড়লো। হীরা হু হু করে ডানা ফটফটিয়ে তার পিছু পিছু তাড়া করলে। মাটি থেকে প্রায় হাত দুই উপরে চিত্রগ্রীব হীরার শ্বাসনলীর চারিদিকে নখ বসিয়ে দিয়ে ক্রমশ চাপ বাড়াতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে অবিরাম ডানার ঝাপট, ইস্পাতের ঠেঙার মত তা তার প্রতিদ্বন্দ্বীর গা থেকে একরাশ বরফের মত সাদা পালক ঝরিয়ে দিলে। সেই ঝরা পালকের ঝাড়ের মধ্যে দুজনে মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে দুই খেপা সাপের মত আক্রোশে ঠোকরাঠুকরি করতে লাগলো। অবশেষে হীরা হাল ছেড়ে দিয়ে মেঝের ওপর ছিন্নভিন্ন সাদা ফুলের মত নেতিয়ে পড়লো, তার একটা ঠ্যাং ভেঙে গেছে। ওদিকে চিত্রগ্রীবের গলা আর ঘাড় প্রায় খালি—পালক আর নাই বল্লেও হয়। কিন্তু লড়ায়ের যাহোক একটা নিষ্পত্তি হল ভেবে সে খুসি। সে ভালোই জানে যে জহরের সঙ্গে লড়ে হীরা তার অর্দ্ধেক জোর খরচ না করলে, সে (চিত্রগ্রীব) হয়ত জিততে পারতো না। সে যাই হোক, ভালোয় ভালোয় শেষ হয়েছে এই ঢের। হীরার পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আর যা যা করণীয় সব করলুম। আধ ঘণ্টা পরে সমস্ত পায়রাগুলো সে-দিনের শেষ খাওয়া খেতে লাগলো—কিছু আগে যা ঘটেছে তা যেন কারো মনেও নেই। মনের মাঝে রাগ পুষে বেজার হয়ে থাকা তাদের অভ্যাস নয়—তারা সব সদ্বংশের সন্তান, তাতে আর সন্দেহ কি?

তাদের সব ছোট যে তারও ব্যবহার নির্দোষ—বলাই বাহুল্য হীরা তার পরাজয় ভদ্রলোকের মত মেনে নিলে।

মাঘ মাস এসে পড়লো। ঠাণ্ডা বাতাস, আকাশ পরিষ্কার, পায়রা-পুরস্কার প্রতিযোগীতা স্বরু হ'ল। প্রত্যেক ঝাঁকের তিন বিষয়ে পরখ হ'ল—একত্রে ওড়া, দীর্ঘপথ ওড়া, আর বিপদের মাঝে ওড়া। প্রথম বিষয়ে আমরা প্রথম পুরস্কার পেলুম, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক দুর্ঘটনার জন্য আমার পায়রারা অপর প্রতিযোগীতা দুটিতে যোগ দিতে পারলে না। যথাস্থানে সে দুর্ঘটনার কথা বলবো।

দলবদ্ধ প্রতিযোগীতা এইভাবে হয়—আলাদা আলাদা ঝাঁক যে যার বাড়ী থেকে আকাশে ওঠে। শিস্ বা অন্য কোনো শব্দ, যা তাদের প্রভুর গলার আওয়াজ বোঝায়, সে-শব্দ যখন আর তাদের কানে পৌছে না, তখন বিভিন্ন দল মিশে যায়। তখন যে পায়রাকে তারা উপযুক্ত ভাবে, তারই চালনায় তারা উড়তে রাজি হয়। এ সমস্তই আকাশে ঘটে, যেখানে পায়রার বুদ্ধি আর প্রবৃত্তিই প্রধান। আর যে পাখী এগিয়ে যায় এবং চালনার ভার যাকে দেওয়া হয়, সে সেই কাজ করে বটে, কিন্তু সেই সম্মানের প্রকৃতি বা কারণ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তার নাই।

টেম্পারেচার ৪৫ ডিগ্রিতে নেমেছে। আমাদের দেশের পক্ষে খুব ঠাণ্ডা সকাল, বস্তুত এ পর্যন্ত এত শীত এই প্রথম। উপরে আকাশ, শীতকালে যেমন, নির্মেঘ ও সুদূর—অস্পর্শনীয় নীলের প্রসার। সহরের বাড়ীগুলো—নীল সাদা হলদে—দেখাচ্ছে যেন

চিত্রগ্রীব

দৈত্যদল ভোরের রঙিন গুহা গহ্বর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বহুদূরে দিগন্ত ধূসর ও বেগুনে বাষ্পে উজ্জ্বল। রাতের খোঁয়াড় থেকে সহরের যত শব্দ আর গন্ধ ছাড়া পেল। চিল আর কাকের ডাক ক্রমেই বেড়ে উঠছে। সমস্ত কলরব ছাপিয়ে কোথা থেকে সানাইয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই সময় সঙ্কেত-বাঁশী বাজলো—খেলা সুরু হয়েছে। অমনি প্রত্যেক পায়রার মালিক আপন আপন ছাত থেকে একটা সাদা নিশান নাড়তে লাগলো। সেই মুহূর্তে অসংখ্য পায়রার ঝাঁক আকাশে উঠলো। ঝাঁকের পর ঝাঁক, রঙের পর রং, পাখার ঘায়ে ঘায়ে তারা সহরের উপর উঠতে লাগলো। কাক আর দু' রকমের চিল—লাল আর বাদামি রঙের—হাজার হাজার পায়রার সশব্দ গতির সামনে থেকে উড়ে পালালো। শীঘ্রই সব ঝাঁকগুলো যেন এক একটি পাখার মত আকাশে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগলো। মনে হল যেন অনেকগুলো মেঘ বড়ো বড়ো ঘূর্ণি হাওয়ার কবলে পড়েছে। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকগুলো উপরে উঠলেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ঝাঁকের মালিক নিজের ঝাঁকটি চিনতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন ঝাঁকগুলো মিশে গিয়ে যখন একটা বড়ো ঝাঁকে পরিণত হয়ে একটা জমাট ডানার দেওয়ালের মত উড়তে লাগলো, আমি তখনো ওড়ার রকম দেখে চিত্রগ্রীব, হীরা, জহর এবং আরো গোটা ছয় পায়রাকে খুঁজে বার করতে পারছি। প্রত্যেক পাখীরই কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ আছে, যার দ্বারা ওড়ার সময় তাকে চেনা যায়। কোনো পায়রার মনোযোগ আকর্ষণ করবার

ইচ্ছা হলে মালিক বারকয়েক থেমে থেমে তীক্ষ্ণ শিস্ দিয়ে সঙ্কেত করে। সে শব্দ শুনতে পেলে পাখী বুঝতে পারে।

শেষে সমস্ত দলটা এত উঁচুতে উঠলো যে পায়রার মালিক শিঙা ফুকলেও সে শব্দ তাদের কানে পৌঁছবে না। এবার চক্রাকারে ওড়া বন্ধ করে তারা সোজা চলতে লাগলো। সর্দারির প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। আকাশের এক ধার থেকে অন্য ধারে যখন তারা কায়দা করে উড়তে লাগলো, আমরা পায়রার মালিকেরা তখন উপর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম, পায়রারা কার সর্দারি স্বীকার করলে তাই দেখবার জন্য। একবার মনে হ'ল আমার জহর যেন চালনা করবে। কিন্তু ঝাঁকের মাথায় পৌঁছতে না পৌঁছতে সকলে ডানদিকে ফিরে গেল। তার ফলে দলে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হ'ল, আর ঘোড়দৌড়ের মাঠের ঘোড়ার মত, অনেক অচেনা পায়রা এগিয়ে পড়লো। কিন্তু কিছু পরে অন্য পায়রার ধাক্কায় আবার তাদের পিছিয়ে পড়তে হল। এত ঘনঘন এমন ঘটতে লাগলো যে প্রতিযোগীতার দিকে আমাদের আর মন রইলো না, মনে হল যেন কোনো অজানা পায়রাই শেষ পর্যন্ত সর্দারির প্রাইজটা মেরে দেবে।

এমন সময় অনেক ছাতের উপর থেকে চীৎকার উঠলো—চিত্রগ্রীব, চিত্রগ্রীব, চিত্রগ্রীব! ঠিক, অনেক পায়রার মালিকই ওই নাম বলে চেঁচাচ্ছে। এবার আমি দেখতে পেলুম—ভুলের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই—প্রকাণ্ড ঝাঁকের মাথায় আমারি পাখী তাদের গতিকে চালনা করেছে। ওঃ কী গৌরব! আকাশের

দিকে দিকে সে তাদের চালিত করছে, প্রতিবার কয়েক ফুট করে উঁচুতে উঠছে, শেষে সকাল আটটার সময় একটি পায়রাকেও আর আকাশের কোথাও দেখা গেল না। তখন নিশান গুটিয়ে নিয়ে পড়া করতে নীচে নেমে গেলুম। দুপুরবেলা আবার ছাতে উঠে প্রত্যেকেই দেখতে পেলে সেই প্রকাণ্ড পায়রার পাঁচিল আবার নেমে আসছে। ঐ যে! চিত্রগ্রীব এখনো তাদের চালনা করছে! আবার চীৎকার উঠলো—চিত্রগ্রীব! চিত্রগ্রীব! হ্যাঁ, তারই জিত, কারণ চারঘণ্টা ধরে সে তার নায়কের পদ বজায় রেখেছে—উপরে ওঠার সময় যেমন, তেমনি নেমেও আসছে সবার আগে!

এবার ওড়ার সবচেয়ে বিপদের অংশ উপস্থিত হ'ল। সেই প্রকাণ্ড ঝাঁকের নায়কদল ভাঙবার হুকুম দিলে—তখন ঝাঁকের পর ঝাঁক আলাদা আলাদা হয়ে নিজের নিজের বাড়িমুখো রওনা হ'ল। চিত্রগ্রীব আমার ছোট ঝাঁকটিকে ছাতার আকারে সাজিয়ে—উদ্দেশ্য, ঘরমুখো পায়রাগুলোর পিছনের দিকটা আগলানো। সর্দারি করার দাম হ'ল তাই—যাকে বলে আত্মত্যাগ।

এবার ভয়ঙ্কর বিপদের পালা। শীতকালে বাজপাখী দক্ষিণে আসে। মরা মাংস তারা খায় না—ঈগল আর শিকরের মত সে-ও নিজের নখাঘাতে যা মারে তাই খায়। তারা অতি নীচ ও চতুর—আমার মনে হয় তারা একরকম ছোটজাতের ঈগল—দেখতে চিলের মত যদিও তাদের ডানার ডগা সুতো-বার-করা নয়। চিলের ঝাঁকের একটু ওপরে তারা জোড়ায় জোড়ায় ওড়ে। সেজন্য শিকার তাদের

দেখতে না পেলেও শিকারের গতিবিধি চিলের আড়ালে থেকে তারা বেশ লক্ষ্য করতে পারে।

সেদিন চিত্রগ্রীবের জিত হবার পরেই দেখতে পেলুম এক ঝাঁক চিলের সঙ্গে একজোড়া বাজ উড়ছে। তখনি মুখের মধ্যে আঙুল পুরে দিয়ে সজোরে শিস দিলুম। চিত্রগ্রীব সেই সংকেত বুঝতে পারলে। নিজের দলকে সে নতুন করে সাজালে। অর্দ্ধচন্দ্র আকারে ঝাঁকটা উড়ছিল—নিজে মাঝখানে থেকে, জহর আর হীরাকে দুই প্রান্তের ভার নিতে হুকুম দিলে। সমস্ত ঝাঁকটা জমাট হয়ে রইলো—যেন একটা বিরাট পাখী। তারপর তারা নীচুপানে নামতে সুরু করলে—দ্রুত থেকে দ্রুততর। আকাশের কাজ এখন সাঙ্গ হয়েছে। সকালে যাদের সঙ্গে খেলা করেছিল তারা সবাই বাড়ী গেছে।

, তাদের এত তাড়াতাড়ি নামতে দেখে একটা বাজ তাদের সামনে পড়লো—হিমালয় চূড়া থেকে খসে-পড়া পাথরের মত। আমার পাখীগুলোর সমান সমান নেমেই সে ডানা মেলে তাদের পানে ঘুরে গেল। এ কিছু নতুন কায়দা নয়, পায়রার ঝাঁকে আতঙ্ক সঞ্চার করবার জন্য প্রত্যেক বাজই এমন করে থাকে। এগারো বারের মধ্যে দশবার সে সফল হয়—কারণ এমন অবস্থায় ভয়ে দিশাহারা হয়ে পায়রারা দলছুট হয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। বাজ এবারেও তাই আশা করেছিল, কিন্তু আমাদের চতুর চিত্রগ্রীব ডানা চালিয়ে নির্ভয়ে শত্রুর পাঁচফুট আন্দাজ নীচে নেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঝাঁকটাকে টেনে নিলে। জমাট দলের উপর শত্রু কখনো

ঝাঁপ দেয় না, সে-কথা জানে বলেই সে এমন করলে। কিন্তু একশো গজ সামনে যেতে না যেতেই, দ্বিতীয়টি, সম্ভবতঃ বাজ-গিন্নি, পায়রাদের সামনে পড়ে তার স্বামীর মতই ডানা মেলে ধরলে। চিত্রগ্রীব কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলে না। সমস্ত ঝাঁকটা নিয়ে সে সোজা তার পানে এগিয়ে গেল। অচিন্তনীয় ব্যাপার। ইতিপূর্বে কোনো পায়রা কখনো এমন করতে সাহস করেনি। বাজ রণে ভঙ্গ দিলে। সে পিছন ফিরতে না ফিরতেই চিত্রগ্রীব দলবল নিয়ে শূন্যে ডুব দিয়ে যত শীঘ্র পারে উড়ে চল্লো। এখন তারা ছাত থেকে প্রায় দশ ফুট উপরে, এমন সময় দুর্ভাগ্যক্রমে বাজ বিস্ফোরক-ভরা কামানের গোলার মত পড়লো ঠিক সেই অর্দ্ধচন্দ্রের মাঝখানে, তারপর ডানা আর আগুনের কাঁটার মত ঠোঁট মেলে ধরে ভীষণ চীৎকার করতে লাগলো। এর ফল ফল্লো, পায়রার জমাট দেওয়াল ভেঙে ঝাঁকটা দুই ভাগ হয়ে গেল। অর্দ্ধেক চিত্রগ্রীবের অনুগামী হল, অপর অর্দ্ধেক ভয়ে আকুল হয়ে কোন্ দিকে যে উড়লো তার ঠিক নেই। বিষম বিপদের সময় যথার্থ নায়ক যা করে চিত্রগ্রীবও তাই করলে। সে সেই ভয়ার্ত্ত দলের পিছু পিছু চল্লো, যতক্ষণ না আবার দুই দলে মিশে এক হয়ে গেল। এমনি হতে না হতে বাজ-বউ নামলো বাজের মতন, চিত্রগ্রীব আর দলের অবশিষ্ট পায়রাদের মাঝে। সে প্রায় তার লেজের উপর এসে পড়ে অন্যদের থেকে তাকে আলাদা করে দিলে। নায়ককে হারিয়ে পায়রাগুলো কোনোদিকে দৃকপাত না করে বিপদ এড়াবার জন্য পালাতে সুরু করলে। চিত্রগ্রীব একেবারে একলা পড়ে গেল, চারিদিক থেকেই এখন আক্রমণের

সম্ভাবনা। তবুও, ভয় না পেয়ে সে তার পলায়নপর অনুচরদের দিকে নামতে লাগলো, হাত আষ্টেক নামতে না নামতে তার সামনে হুস্ করে নামলো কর্তা-বাজ। শত্রুকে এত কাছে পেয়ে সে দুঃসাহসী হয়ে উঠলো-- সে খেলে এক ডিগবাজী। তার বরাত ভালো, কারণ, এরকম না করলে বাজ বউ তখনি তাকে ধরে ফেলতো—পিছন দিক থেকে সে থাবা ছুঁড়েছিল।

ইতিমধ্যে আমার অন্য পায়রাগুলো পাখা চালিয়ে আসছে—প্রায় বাড়ী পৌছে গেছে। গাছ থেকে পাকাফল যেমন করে পড়ে তেমনি করে তারা ছাতের উপর ঝুপ্ ঝুপ্ করে পড়তে লাগলো। তাদের মধ্যে একজন কিন্তু কাপুরুষ নয়। বরং সে সাহসের অবতার বল্লেও চলে। সে হচ্ছে জহর—কালোমাণিক। সমস্ত পায়রা ছাতে থিতিয়ে বসার পর সে ডিগবাজী খেয়ে উপরে উঠে গেল। তার মতলব বেশ স্পষ্ট। সে চিত্রগ্রীবকে সাহায্য করতে চলেছে। তাকে আবার ডিগবাজী খেতে দেখে কর্তা-বাজ মতলব বদলে ফেল্লে, চিত্রগ্রীবকে ছেড়ে সে জহরের পিছনে সোঁ করে নামলো। তারপর চিত্রগ্রীব করলে কি—সে ডুব মারলে জহরকে বাঁচাবার জন্য। ঘুরে ঘুরে এঁকে বেঁকে বিদ্যুতের দড়ার মত সে হু হু করে নামতে লাগলো, তার পিছু ধাওয়া করতে করতে বাজ-বউয়ের হাঁপ ধরে গেল। চিত্রগ্রীবের মত অত ঘুরপাক খাওয়া তার কর্ম নয়। এদিকে ঝানু কর্তা-বাজ টিপ্ করার জন্য উপরে উঠছেন—এবার জহরের বিপদ। একটা ভুল চাল দিলেই কর্তা বাজ তাকে ধরে ফেলবে। আহা; বেচারা! যা তার করা অনুচিত সে তাই করে বসলো। সে

বাজের তলায় সরল রেখায় উড়তে লাগলো। বাজ অমনি ডানা মুড়ে ফেলে নিঃশব্দে পড়লো। এতটুকু শব্দও শোনা গেল না—নীচে নীচে আরও নীচে সে মূর্তিমান মৃত্যুর মত নেমে আসছে। তারপর সে অতি ভয়ানক কাণ্ড! কি করে বলা যায় না, কিন্তু সেই বাজ আর জহরের মাঝে চিত্রগ্রীব এসে পৌঁছুলো শত্রুকে বাধা দিয়ে তাকে বাঁচাবার জন্ম। হায়, আক্রমণে নিরস্ত না হয়ে বাজ তার থাবা ছুড়ে দিয়ে চিত্রগ্রীবকে, সজোরে না হলেও, একরকম ধরে ফেলে। শূন্যে ঝরঝর করে পালক-বৃষ্টি হয়ে গেল। শত্রুর কবলে চিত্রগ্রীবের দেহ যেন ছটফট করছে দেখতে পেলুম। তপ্ত লোহার শিক যেন গায়ে ফুটেছে এমনিভাবে আমি আমার পাখীর জন্ম যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ঘুরে ঘুরে উঁচু থেকে উঁচুতে বাজ তাকে নিয়ে চলেছে থাবা দিয়ে তাকে বাগিয়ে ধরবার চেষ্টা করতে করতে। এখানে একটা অপমানকর ব্যাপার স্বীকার করি—চিত্রগ্রীবকে রক্ষা করার দিকে আমার সমস্ত মন ছিল, তাই দেখতে পাইনি বাজ-বউ কখন জহরকে ধরে ফেলে। চিত্রগ্রীব ধরা পড়ার পরই তা ঘটে গেছে। এখন জহরের পালকে শূন্য ভরে উঠলো। শত্রু তাকে থাবার মধ্যে চেপে ধরে আছে, ছাড়া পাবার জন্ম তার কোন চেষ্টাই নাই। কিন্তু চিত্রগ্রীব তেমন নয়; কর্তা বাজের কবলে সে তখনও ঝটপট করেছে। শিকার যাতে বেশ বাগিয়ে ধরতে পারে স্বামীকে সেই সাহায্য করবার জন্মই যেন বাজ-বউ স্বামীর খুব কাছে কাছে উড়তে লাগলো। ঠিক সেই সময় জহর ছাড়া পাবার জন্ম ঝটপট করে উঠলো।

সেই ঝটকায় বাজ-বউ এত কাছে এসে পড়লো যে স্বামীর ডানার সঙ্গে তার ডানার ধাক্কা লাগলো। স্বামী টাল সামলাতে পারলে না। শূন্যে প্রায় উল্‌টে যাবার উপক্রম—সেই সুযোগে আর একবার পালক ঝরিয়ে দিয়ে ঝটকা মেরে চিত্রগ্রীব বাজের কবল থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিলে। তারপর নীচুপানে পড়তে লাগলো সে হুহু করে—আর ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে রক্ত-মাখা দেহে পাখীটা ছাতের উপর এসে পড়লো। তার আঘাত পরীক্ষা করবার জন্য তাকে তুলে নিলুম। তার দু পাখাই কেটে গেছে, কিন্তু খুব বেশি নয়। তখনি তাকে পায়রার ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলুম—তিনি ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরে চিত্রগ্রীবকে তার বাসায় রেখে দিলুম, কিন্তু জহরকে কোথাও দেখতে পেলুম না। তার বাসা খালি। তখন ছাতে উঠে দেখি জহরের বউ পাঁচিলের উপর বসে আকাশের চারিদিকে চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে স্বামীর সন্ধান করেছে। কেবল সেদিন নয়, আরো দু তিন দিন সে সেইভাবে কাটালো। তার স্বামী সাহসী সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে, এ-কথা ভেবে সে মনে কোনো সান্ত্বনা পেলে কি না জানি না।

তিন

চিত্রগ্রীবের ঘা ভারি আস্তে আস্তে সারতে লাগলো। মাঘ মাসের প্রথম পর্যন্ত তাকে ছাতের কুড়ি হাত উপরের বেশি উড়ানো যেত না। তা ছাড়া খুব কম সময়ই সে ওড়া অবস্থায় থাকতে পারতো। যতই ঘন ঘন তাকে ছাতের উপর থেকে তাড়িয়ে দিই না কেন, পনেরো মিনিটের বেশি তাকে উড়িয়ে রাখতে পারি' না। প্রথমে ভেবেছিলুম তার ফুসফুস বিকল হয়েছে। পরীক্ষার পর যখন জানা গেল ফুসফুস ঠিক আছে, তার ওড়ার অনিচ্ছার কারণ স্থির করলুম তার হৃদ্‌যন্ত্র—হয়ত এর আগেই দুর্ঘটনায় তার হৃদ্‌যন্ত্র জখম হয়েছে! দ্বিতীয়বার পরীক্ষার পর দেখা গেল আমার সে ধারণাও ভুল।

চিত্রগ্রীবের ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে শেষে ঘণ্ডালুকে এক লম্বা চিঠি দিয়ে আগাগোড়া ব্যাপার সমস্ত বর্ণনা করলুম। সে তখন জনকয় ইংরেজের সঙ্গে শিকারে গেছে।

সেদিক থেকে কোন সাহায্য না পেয়ে আমার পায়রাটিকে খুব সাবধানে পরীক্ষা করা স্থির করলুম। দিনের পর দিন বাড়ির ছাতের উপর বসিয়ে তাকে লক্ষ্য করি, কিন্তু কি যে তার ব্যারাম তার কোন কিনারা হল না। কাজেই চিত্রগ্রীব যে আবার উড়বে সে আশা ত্যাগ করলুম।

প্রায় দিন পনেরো পরে ঘণ্ডালুর কাছ থেকে ছোট্ট এক চিঠি পেলুম। চিঠিখানা সে গভীর জঙ্গলের মাঝ থেকে পাঠিয়েছে। সে লিখেছিল—তোমার পায়রাকে ভয়ে ধরেছে। তার ভয় ভাঙো—

তাকে উড়তে বাধ্য করো! কিন্তু কি করে, সে-কথা লেখেনি। চিত্রগ্রীবকে তার ডানার ভরে শূন্যে তোলার কোন উপায়ই ঠাহর হয় না। ছাতের উপর থেকে তাকে তাড়ানো নিষ্ফল, এক কোণ থেকে তাড়া দিলে সে উড়ে আর এক কোণে গিয়ে বসে। সব চেয়ে নিরাশার কথা, আকাশে উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকের বা মেঘের ছায়া তার উপর এসে পড়লে সে ভয়ে কাঁপতে থাকে। নিশ্চয়ই ছায়া দেখলেই তার মনে হয়, এই বুঝি বাজ বা শিকরে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এ থেকে চিত্রগ্রীবের মনের অবস্থা বুঝতে পারলুম। এই ভয়ের রোগ কি করে সারাই কিছুই বুঝি না। হিমালয়ে থাকলে নয় সেই সাধুর কাছে তাকে নিয়ে যেতুম, যিনি একবার তাকে ওই রোগ থেকেই মুক্ত করেছিলেন, কিন্তু সহরে ত আর লামা নাই, কাজেই অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি।

ফাল্গুনে বসন্ত এল। তখন এক অসাধারণ ব্যাপার ঘটলো—চিত্রগ্রীবের পালক ঝরে নূতন পালক বার হল। তাকে দেখতে হল বিশাল গভীর সাগরের মাঝখানটির মত। এত সুন্দর যে বর্ণনা করা যায় না। একদিন, কি করে জানি না, দেখলুম সে জহরের বিধবার সঙ্গে কথা কইছে। বসন্তের আগমনে মেয়েটিকে খাসা দেখাচ্ছিল। রোদের মাঝে তার কালো ওপ্যালের মত রং চকচক করছে—গরম দেশের তারায়-ভরা রাতের মত। আমি অবশ্য জানতুম তাদের দুজনের বিয়ে সন্তানের পক্ষে খুব ভালো না হলেও, তার বাবা জহরের মরার পর থেকে চিত্রগ্রীবের মনে যে ভয় আর মেয়েটির মনে যে দুঃখ বাসা বেঁধেছিল, তা দূর হতে পারে।

তাদের বন্ধুত্ব বাড়ার সুযোগ দেবার জন্য দুজনকে একটা খাঁচায় ভরে আমার বন্ধু রাজার কাছে নিয়ে গেলুম। প্রায় দু'শ মাইল দূরে জঙ্গলের ধারে সে থাকে। সে গ্রামের নাম ঘাটশিলা। নদী-তীরে গ্রাম, নদীর ওপারে বনজঙ্গলে-ঢাকা উঁচু উঁচু পাহাড়, তার মধ্যে রকমারি জন্তু-জানোয়ার। রাজা সে গ্রামের পূজারি, এ কাজ তার পূর্বপুরুষ হাজার বছর ধরে করে এসেছে। সে আর তার বাপ্‌-মা মস্ত পাকা বাড়িতে বাস করে। বাড়ির কাছেই গ্রামের মন্দির, সেটিও পাকা বাড়ী। মন্দিরের উঠানের চারিদিকে উঁচু দেওয়াল—প্রতি রাত্রে সেখানে চাষাভূতেরা জমায়েত হয়, তাদের কাছে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করা তার কাজ। ভিতরে বসে সে যখন চেঁচিয়ে পড়তে থাকে, তখন বাহিরে বহুদূর থেকে বাঘের গর্জন শোনা যায়, কখনো বা সরু নদীর ওপার থেকে বুনো হাতীর হুঙ্কার ভেসে আসে। জায়গাটি সুন্দর ও ভয়ঙ্কর। ঘাটশিলা গ্রামে ভয়ের কারণ না থাকলেও সেখান থেকে অল্প দূর গেলেই যে কোনো হিংস্র জন্তুর দেখা মিলিবে।

ট্রেণ রাত্রে ঘাটশিলা পৌছলো। ষ্টেশনে রাজা আর তার দুজন লোক আমাকে অভ্যর্থনা করলে। একজন আমার মোটমাট কাঁধে নিলে, অপর লোকটি নিলে সেই দুই পায়রা-ভরা খাঁচা। আমাদের প্রত্যেকের হাতেই একটি করে হারিকেন লণ্ঠন। একজন চাকর সামনে, একজন পিছনে, এমনিভাবে আমরা সারবন্দি ঘণ্টাখানেক চল্লুম। আমার কেমন সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসা করলুম, আমরা কেমন সন্দেহ হল ?

রাজা বল্লে, বসন্তকালে বুনো জন্তুরা উত্তরপানে এখান দিয়ে যায়। বনের ভিতর দিয়ে সোজা রাস্তায় যাবার যো নেই!

"বাজে কথা!" আমি বল্লুম। "আমি এর আগে অনেকবার গেছি। আমরা বাড়ি পৌঁছুব কখন?"

"আধঘণ্টার মধ্যে —"

অমনি পায়ের তলায় মাটি ফেটে গিয়ে অগ্নিগিরির উচ্ছ্বাসের মত ভীষণ শব্দ-রব উঠলো—হোয়া—হো—হো—হো—হোয়া!

পায়রাগুলো ভয়ে খাঁচার মধ্যে পাখা ঝটপটিয়ে সারা। আমার খালি হাত দিয়ে খাঁ করে রাজার কাঁধটা চেপে ধরলুম, কিন্তু আমার ভয়কে অগ্রাহ্য করে সে হো-হো করে হেসে উঠলো। আর যেমন প্রভু তেমনি চাকর—তারাও হেসে লুটোপুটী।

হাসি থামলে রাজা বুঝিয়ে দিলে—জঙ্গলের পথ দিয়ে অনেকবার না চলেছ? লণ্ঠনের আলোয় ভয় পেয়ে বাঁদরগুলো চেঁচিয়ে উঠলো, তা শুনে তবে এত ঘাবড়াও কেন?

বাঁদর? আমি প্রশ্ন করলুম।

বন্ধু বল্লে, হ্যাঁ, বছরের এ সময়টাতে অনেক বাঁদর উত্তরে যায়। মাথার ওপর গাছে মস্ত একদল বাঁদরকে আমরা ভয় পাইয়ে দিয়েছি—ব্যাপার এই। ভবিষ্যতে বাঁদরের চীৎকারকে বাঘের গর্জন বলে ভুল কোরো না!

ভাগ্যক্রমে আমরা শীঘ্রই বাড়ি পৌঁছলুম। পথে ভয়ের ব্যাপার আর কিছু ঘটেনি।

পরদিন সকালে রাজা গেল মন্দিরে পূজা করতে, আর আমি ছাতে উঠে পাখীগুলোকে খাঁচা থেকে বার করলুম। প্রথমে তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মুঠোভরা ঘিয়ে-ভাজা দানা নিয়ে আমি কাছে খাড়া রয়েছি দেখে, তারা অশঙ্কোচে খেতে সুরু করে দিলে। সেদিন প্রায় সারাক্ষণ আমরা ছাতের উপর কাটালুম, বেশিক্ষণ তাদের একলা রাখতে সাহস হল না, পাছে অচেনা জায়গা দেখে তারা ভড়কে যায়।

পরের হপ্তা পার হতে না হতেই ঘাটশিলায় পাখীদুটোর মন বসে গেল, দুজনে বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠলো। এখন বুঝলুম এ দুটি পাখীকে দলছাড়া করে ভালোই করেছি। ঘাটশিলা পৌঁছবার দিন আষ্টেক পরে রাজা আর আমি অবাক হয়ে দেখি চিত্রগ্রীব তার সঙ্গিনীর পিছু পিছু উড়ে চলেছে। সঙ্গিনী উড়ছিল নীচু দিয়ে, চিত্রগ্রীব তার পিছু নিলে। সে কাছে এসে পড়লো দেখে সঙ্গিনী উঁচুতে উঠে উল্টোপথে চলতে সুরু করলে। সেও তাই করলে। আবার সঙ্গিনী উঠলো, কিন্তু এবার সে রণে ভঙ্গ দিয়ে তার তলায় গোল হয়ে উড়তে লাগলো। যাই হোক, আমার মনে হল চিত্রগ্রীবের সাহস ফিরে আসছে। পায়রার সেরা চিত্রগ্রীব ভয় থেকে মুক্ত হচ্ছে, শূন্যের আতঙ্ক তার কেটে যাচ্ছে—আকাশে ওড়া আবার তার পক্ষে সহজ হয়ে এল।

পরদিন সকালে পাখীদুটো আরো উঁচুতে উঠে খেলা করতে লাগলো। সমস্ত পথ যেতে চিত্রগ্রীবের এখনো আপত্তি—সঙ্গিনীর তলায় গোল হয়ে না উড়ে সে তাড়াতাড়ি নেমে আসতে লাগলো।

ব্যাপার কি বুঝতে পারলুম না, কিন্তু রাজার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ, সে বল্লে, পাখার মত বড় একটুকরো মেঘ সূর্যের ওপর এসে পড়েছে। তার ছায়া এমন হঠাৎ পড়লো যে চিত্রগ্রীবের ভয় হল বুঝি বা তার শত্রু৮ মেঘ সরে যাক, তখন...

রাজার কথাই ঠিক। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সূর্য, বার হয়ে এল, আবার তার আলো চিত্রগ্রীবের পাখা বেয়ে ঝরে পড়তে লাগলো। অমনি সে নিচে নামা থামিয়ে দিয়ে শূন্যে চক্রাকারে উড়তে লাগলো। তার সঙ্গিনীও তার নাগাল পাবার জন্য নেমে আসছিল, সে একশো ফুট আন্দাজ উপরে অপেক্ষা করতে লাগলো। তখন চিত্রগ্রীব উঠলো—পিঞ্জরমুক্ত ঈগলের মত ডানা চালিয়ে। উপর থেকে ক্রমে আরো উপরে দুলে দুলে ওঠবার সময় সূর্যের আলো তার আশেপাশে যেন রঙের পুকুর তৈরি করতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই, সঙ্গিনীর অনুসরণ না করে সে তাকেই চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলো। এমনি করে তারা আকাশে উঠলো— চিত্রগ্রীবের ভয় সম্পূর্ণ সেরে গেছে। তার ক্ষিপ্রতা আর শক্তি দেখে তার সঙ্গিনী মুগ্ধ হয়।

পরদিন সকালে দুজনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো। অনেকক্ষণ ধরে অনেকদূর তারা উড়লো। শেষে পাহাড়ের ওপারে তারা অদৃশ্য হল—যেন গিরিচূড়ার উপর দিয়ে গড়িয়ে অপর দিকে পড়লো। প্রায় ঘণ্টাখানেক তাদের দেখা নাই।

শেষে প্রায় এগারোটার সময় তারা ফিরলো প্রত্যেকে ঠোঁটে একটি করে বড় খড় নিয়ে। এবার তারা ডিম পাড়বার জন্য বাসা

বাঁধবে। ভাবলুম তাদের বাড়ি নিয়ে যাই, কিন্তু রাজা অন্তত আরো এক সপ্তাহ থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

সেই সপ্তাহের প্রতিদিন আমরা নদীর ওপারে কয়েক ঘণ্টা করে জঙ্গলে কাটাতে লাগলুম। রাজার বাড়ীর ক্রোশ আড়াই দূরে সেই গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেবার জন্য পায়রাদুটোকে সঙ্গে নিতুম। উঁচুতে ওড়া আর নিজের দিক্-বোধ পরীক্ষা করা ছাড়া আর সমস্তই চিত্রগ্রীব ভুলে গেল। এক কথায়, সঙ্গিনীর প্রতি ভালবাসা আর স্থান পরিবর্তন, তার সেই ভয়ানক ব্যারাম—ভয়, একেবারে সারিয়ে দিলে।

ভয় ভাবনা আর ঘৃণা এই তিনটিই আমাদের সব দুঃখের কারণ। এই তিনটির একটি কাউকে ধরলে সঙ্গে সঙ্গে অপর দুটিও এসে জুটবে। গোড়ায় শিকারকে ভয় পাইয়ে তবেই হিংস্র পশু তাকে বধ করতে পারে। আসলে, কোন জন্তুই মরে না, যতক্ষণ না তার ঘাতক তার মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে। এক কথায়, শত্রু শেষ আঘাত দেবার আগে জন্তু মারা পড়ে ভয়ে।

চার

শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে বাচ্চাগুলো জন্মাবার পরেই হীরা ও চিত্রগ্রীব ঘণ্ডালুর সঙ্গে বোম্বাই রওনা হল ইউরোপের মহাযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য। চিত্রগ্রীবের সঙ্গে আইবুড় পাখী হীরাকেও পাঠালুম, কারণ সৈন্যদলে দুজনেরই কাজ আছে।

ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আগে চিত্রগ্রীব যে তার বাচ্চাগুলোকে দেখে যেতে পারলে তাতে আমি খুব খুসি হলুম। তার বিশেষ কারণ এই যে, আমি জানতুম, যে পায়রার স্ত্রী আর বাচ্চা তার জন্য বাড়ীতে অপেক্ষা করে, সে-পায়রা প্রায়ই বাড়ী না ফিরে থাকতে পারে না। চিত্রগ্রীব ও তার পরিবারের মধ্যে এই স্নেহের বাঁধন থাকাতে আমি বেশ বুঝলুম যে সে হরকরার কাজ খুব ভালোই করতে পারবে। গোলাগুলি বন্দুক কামানের শব্দ যতই হোক, বেঁচে থাকলে যুদ্ধশেষে সে বাড়ী ফিরবেই।

কেহ হয়ত প্রশ্ন করতে পারে যে পায়রার বাড়ী হল কলিকাতা আর যুদ্ধ হল হাজার হাজার ক্রোশ দূরে। সে কথা সত্য। তবুও ঘরে স্ত্রী পুত্র রেখে যাওয়ায় সে ঘণ্ডালুর কাছে তার বিদেশের বাসায় অন্তত ফেরবার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

শোনা যায় চিত্রগ্রীব কয়েকটি জরুরি খবর বহন করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রধান সেনাপতির শিবিরে কয়েকবার যাতায়াত করেছিল। ঘণ্ডালু ছিল প্রধান সেনাপতির সঙ্গে। প্রথম প্রথম চিত্রগ্রীব ঘণ্ডালুর অনুরক্ত থাকলেও শেষের কয় মাস সেনাপতির প্রতি তার খুব ভালোবাসা হয়।

চিত্রগ্রীব

আমার বয়স কম, আমাকে কাজে বাহাল করা অসম্ভব, তাই যুদ্ধে আমি যাইনি; বুড়ো ঘণ্ডালুকেই পায়রাদুটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে ফরাসী বন্দর মার্সেল যাবার সময় জাহাজে হীরা, চিত্রগ্রীব আর বুড়ো শিকারী তিনজনে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠলো। কোনো অচেনা জন্তুই বেশিক্ষণ ঘণ্ডালুর বন্ধুত্ব এড়াতে পারে না। পায়রাদুটো তাকে আগে থেকেই জানতো, তাই তাকে ভালবাসা তাদের পক্ষে সহজ। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে পর বৎসরের বসন্তকাল পর্যন্ত আমাদের দেশের সেনাদল ফরাসী দেশের ফ্ল্যাণ্ডার্সে থাকার সময় ঘণ্ডালু সেনাপতির শিবিরের কাছে খাঁচা নিয়ে থাকতো, আর হীরা কিম্বা চিত্রগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে যেত। সেখানে মাঝে মাঝে পাতলা ফিনফিনে কাগজে (ওজন ১ আউন্সের বেশি নয়) খবর লিখে তার পায়ে বেঁধে তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ত। চিত্রগ্রীব উড়ে ঠিক ঘণ্ডালুর কাছে গিয়ে হাজির হ'ত। সেখানে খবরের মানে বার করে প্রধান সেনাপতি নিজে তার জবাব দিতেন। শুনতে পাই তিনি চিত্রগ্রীবের কাজের তারিফ করতেন, আর তাকে খুব ভালোবাসতেন।

কিন্তু চিত্রগ্রীবের গল্প তার মুখে শোনাই ভালো। স্বপ্নের কথা যেমন স্বপ্ন যে দেখে সে ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না, তেমনি চিত্রগ্রীবের অভিজ্ঞতা সে নিজেই বলুক—

"কালাপানি পার হবার পর—ভারত-মহাসাগর ও ভূমধ্য-সাগর —আমরা রেলগাড়িতে এক সম্পূর্ণ অচেনা দেশের ভিতর দিয়ে

চললুম। আশ্বিন মাস, তবুও সেই দেশ—ফ্রান্স, ঠাণ্ডা যেন শীতের দক্ষিণ ভারত। ভাবলুম হিমালয়ের দিকে চলেছি, বরফে ঢাকা পাহাড় আর অতিকায় গাছ এবার দেখতে পাবো। কিন্তু দিগন্তে আমাদের দেশের খুব লম্বা বাঁশগাছের চেয়ে উঁচু পাহাড় নজর হল না। দেশ ত উঁচু নয়, তবে ঠাণ্ডা কেন বুঝতে পারি না!

"অবশেষে যুদ্ধের জায়গায় এসে পৌছলুম। যুদ্ধক্ষেত্রের পিছন দিক কিন্তু সেখানেও অগ্নিবর্ষী কামানের বুম্বুম্ শোনা যাচ্ছে। আকার ও প্রকার যেমনি হোক, কামান মাত্রেই আমার দু'চক্ষের বিষ। সেই ধাতুর তৈরি কুত্তাগুলোর ঘেউ-ঘেউ আর মৃত্যুবর্ষণ আমার ভালো লাগলো না। দিন দুই পরে আমাদের ওড়ার পরীক্ষা আরম্ভ হল। হীরা ও আমি ছাড়া আমাদের সহরের আর চারটি মাত্র পায়রা সেখানে ছিল। হীরার গোঁয়ারতুমি তোমার অজানা নয়। একটা বড় গ্রামের বাড়িগুলো ছাড়িয়ে যেই ওপরে ওঠা অমনি সে বুম্বুমের দিকে উড়তে সুরু করে দিলে। কি হচ্ছে তার সন্ধান করবার ইচ্ছে। যাই হোক, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত। বাপরে কি আওয়াজ! গাছের আড়াল থেকে ধাতুর তৈরি কুত্তাগুলো মুখ থেকে বড়ো বড়ো আগুনের গোলা বজ্রের মত হুহুঙ্কারে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে, আর সেগুলো সাঁই সাঁই শব্দে আমাদের পায়ের তলায় ফেটে যাচ্ছে। দেখে শুনে ভয় পেয়ে ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগলুম। কিন্তু অত উঁচুতেও শান্তি কই? কোথা থেকে সব প্রকাণ্ড ঈগল হাতীর মত ডাক ছাড়তে ছাড়তে এসে পড়লো। সেই ভীষণ দৃশ্য

না দেখে আমরা দৌড় দিলুম যেদিকে ঘণ্ডালু আমাদের অপেক্ষায় ছিল। ঈগলগুলোও—দুটো—আমাদের পিছু নিলে। জোরে আরো জোরে আমরা উড়তে লাগলুম। আমাদের বরাত ভালো, তারা আমাদের নাগাল পেলে না। ঠিক তারপর কিন্তু যা ভেবেছিলুম তাই হল—দেখি ঈগলগুলো আমাদের থাকবার জায়গায় নেমে আসছে। মনে হল যম এসে হাজির—ঈগলগুলো খাঁচার মধ্যে আমাদেরকে নেউলের মত মারলে বলে! কিন্তু না! শীগ্‌গিরই তাদের হাঁকডাক থেমে গেল—তাদের প্রাণহীন দেহ মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লো! তারপর দেখি পাখীদুটোর পেটের ভিতর থেকে দুটো মানুষ লাফিয়ে পড়ে হেঁটে চলে গেল। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, ঈগলে মানুষ গিল্‌লে কেমন করে—আর লোকগুলো জ্যান্ত বেরিয়ে এলই বা কি করে?

"দেখতে দেখতে লোকদুটো কাজ সেরে ফিরে এল, ঈগলের মধ্যে গিয়ে উঠলো, তারপর গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে তারা বেঁচে উঠে আবার শূন্যে উড়ে গেল। তখন আর আমার সন্দেহ রইলো না যে তারা মানুষের রথ। সেকথা বুঝতে পেরে আমি আশ্বস্ত হলুম।

"প্রথম প্রথম সবই অদ্ভুত ঠেকছিল, অভ্যস্ত হবার পর আর তেমন মনে হল না। তবুও সেই অবিরাম বুম্বুম্ আর ঘেউ-ঘেউ শব্দের মাঝে সুনিদ্রার সমস্যা মিটলো না। সৈন্যদলের মাঝে সেই ক'মাস ভালো করে একদিনও ঘুমুতে পারিনি। কাজেই হীরা ও আমি ডিমফাটা সাপের বাচ্চার মত ভীত ও চঞ্চল হব তাতে আর আশ্চর্য কি!

"আমার প্রথম 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে রিসালাদারের কাছ থেকে একটা খবর নেওয়া। সেখানে নানা রকমের কুত্তা ডাকছে, আর দিনরাত মুখথেকে আগুন বার করছে। রিসালাদারের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ভারতবর্ষের অনেক সৈনিক তার অধীনে। আগাগোড়া কালো ক্যাম্বিসে মোড়া খাঁচার মধ্যে আমাকে নিয়ে সে তার চল্লিশ জন সৈনিকের সঙ্গে সামনের 'ট্রেঞ্চ' বা খাতের দিকে যাত্রা করলে। অনেক ঘণ্টা অনেক রাত চলে—অন্ধকার খাঁচার মধ্যে আমার তাই বোধ হ'ল—গন্তব্যস্থলে পৌছলুম। তখন আমার খাঁচার ঢাকা খোলা হল। আমার চারিদিকে কেবল দেওয়াল, সেখানে পাগড়িধারী ভারতবর্ষের লোক ছোট ছোট পোকা-মাকড়ের মত হানা দিয়ে চলছে। মাথার ওপরে সেই কলের ঈগলগুলো ভয়ে চীৎকার করতে করতে উড়ে বেড়াচ্ছে। এখানে এসে প্রথম আমি শব্দ বুঝতে সুরু করলুম। এলোমেলো একটা বুম্‌বুম্‌ শব্দের বদলে, নানা রকমের শব্দ কানে পৌছুতে লাগলো। আশপাশের মানুষের কথা বোঝাই সব চেয়ে শক্ত। কানে-তালা-দেওয়া শব্দের তলায় তাদের কথাবার্তা ঘাসের মাঝে মৃদু মন্থর বাতাসের ফিস-ফিসানির মত শোনাতে লাগলো। মাঝে মাঝে তারা ধাতুর তৈরি কুত্তার মুখ খুলে দেয়—মুখ থেকে আগুন ছিটিয়ে ছিটিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেটা ডাকতে থাকে। তারপর শুনতে পাই হায়েনার হাসি। শত শত লোক সেই ছোট ছোট কুকুরছানাগুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাদের ভয়ানক কাশি বার করায়—পাক্‌-পাফ্‌, পাক্‌-পাফ্‌ পাক্‌-পাফ্‌! সে শব্দ ডুবে যায় ওপনের ঈগলদের গুরু-



গম্ভীর শব্দে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে, আর কখনো কুকুরের মত ডাকছে, কখনো বা পাগলের মত তীক্ষ্ণ শব্দ করছে, আর পরস্পরকে চড়ুইপাখীর মত হত্যা করছে। আমি যে রিসালাদারের অধীনে, সে তার 'কুকুরছানা'র মুখ আকাশের দিকে ফিরিয়ে পাক্-পাফ্ শব্দে খানিকটা আগুন ছেড়ে দিলে, আর অমনি 'ঈগল'গুলোর মধ্যে একটা ধপ্ করে পড়লো ঠিক যেন একটা খরগোস। এইবার সবচেয়ে গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল—বুম্—বাজুম—বম্—বম্! প্রকাণ্ড জিনিসটার বাঘের গর্জনের বিরাট মহিমা শূন্যে উঠে ছড়িয়ে গেল অপার্থিব সুরের চাঁদোয়ার মত—আর সমস্ত ছোটখাট শব্দ সেই অসীম শব্দের মাঝে ডুবে গেল। সেই অর্গ্যানের শব্দের কী অসহ মাধুর্য্য! সে কি কখনো ভোলা যায়? গর্জনের পর গর্জন, বিপুল সুরের পর সুর—মহাপ্রলয়ে যেন শব্দের পাহাড় হুড়ামড়ি করে ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে!

"সৌন্দর্য মরণের এত কাছে থাকে কেন? মাথার ওপরে সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতের অবর্ণনীয় মহিমা আমার অন্তরকে অভিভূত করার আগেই আমাদের চারিদিকে আগুনের গোলা মুষলধারে বৃষ্টির মত পড়তে লাগলো। জলভরা গর্তের মধ্যে গেছো ইঁদুরের মত মানুষ পড়ছে আর মরছে। রিসালাদারের গা থেকে রক্ত বার হচ্ছে, দেহ তার লাল হয়ে উঠছে। সে একটুকরো কাগজের ওপর তাড়াতাড়ি কি লিখে আমার পায়ে বেঁধে খাঁচা খুলে দিলে। চোখের চাউনি দেখে বুঝলুম তার ভারি বিপদ—ঘণ্ডালুর সাহায্য সে চাইছে।

"অবশ্য আপনি জানেন আমি ওপর দিকে উড়লুম। কিন্তু যা

দেখলুম তাতে আমার ডানা জমে যাবার উপক্রম হল। ট্রেঞ্চের ওপরের আকাশ যেন ফুটন্ত আগুনের একখানি অখণ্ড পাত। তার ওপরে কি করে ওঠা যায় সে হল এক সমস্যা। লেজের হাল চালিয়ে প্রত্যেক দিকে গতিকে ফেরাতে লাগলুম। কিন্তু যেদিক দিয়েই উঠি না কেন, দেখি আমার ওপর লক্ষ লক্ষ আগুনের মাকু চলছে—জীবনের তাঁতে রক্তমাখা মরণের কাপড় বোনা হচ্ছে। কিন্তু আমাকে উঠতেই হবে—আমি চিত্রগ্রীব—আমার বাপের বেটা। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা বাতাসের ঘূর্ণির মধ্যে এসে পড়লুম, সেটা আমাকে হুস্ করে টেনে নিয়ে ঘুরপাক দিয়ে ওপরে তুলে দিলে এমনভাবে, যেন আমার ডানা ভেঙে গেছে আর আমি যেন পাতার মত হালকা হয়ে গেছি! সেই ঘূর্ণি আমাকে ওপর নীচে ঘুরপাক খাওয়াতে লাগলো, যতক্ষণ না আমি সেই আগুনের কাপড ভেদ করে চলে গেলুম। তখন আর কিছু দেখবার ইচ্ছে নেই। মনে মনে কেবল আওড়াচ্ছি—ঘণ্ডালুর কাছে, ঘণ্ডালুর কাছে! যখনি সেকথা বলি তখনি তা হাতীর ডাঙসের মত আমার মনে বিঁধে যায়, আর আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি। অনেক উঁচুতে উঠে দিক ঠিক করে নিয়ে পশ্চিমে চল্লুম। ঠিক সেই সময় একটা গুলি আমার 'হাল' ভেদ করে সেটা ভেঙে দিলে—আমার লেজের অর্দ্ধেক পুড়ে খসে পড়লো। বুঝতেই পারো কি রকম খেপে গেলুম, ওই লেজেতেই আমার ইজ্জৎ! সে লেজে কারো ছোঁয়া পর্যন্ত সহ্য করতে পারি না, তাতে গুলি লাগানো ত দূরের কথা। যাই হোক্, আমি নিরাপদে বাড়ী পৌঁছলুম। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে

নামবার উদ্‌যোগ করছি, আমার ওপরে তুটো 'ঈগল' পরস্পরে লড়াই সুরু করে দিলে। আমি তাদের আওয়াজও শুনতে পাইনি, মুখও দেখিনি। তারা পরস্পরকে হত্যা করলে কিছু মনে করতুম না, কিন্তু তারা আমার পিছনে একটা আগুনের ঝড় ছেড়ে দিলে। যতই তারা লড়ে ততই তাদের ঠোঁট থেকে আগুন পড়তে থাকে। যতটা পারি ডুব মেরে পাশ কাটিয়ে চলতে লাগলুম। কেবল যদি সেখানে গোটাকতক গাছ থাকতো! অবশ্য গাছ সেখানে ছিল, কিন্তু তার অধিকাংশ গোলাগুলির ঘায়ে নেড়া হয়ে গেছে। এখন তারা কেবল খোঁটার মত দাঁড়িয়ে আছে—এখন তাদের বড়ো বড়ো ডালপালাও নেই, ছায়া-করা সুন্দর পাতাও নেই। তাই আমি সেই সব জীর্ণ খোঁটাখুঁটির মাঝ দিয়ে এঁকেবেঁকে চল্লুম হাতীকে এড়াবার জন্যে জঙ্গলে মানুষ যেমন করে পালায়। শেষে বাড়ী পৌঁছে ঘণ্ডালুর কব্জির ওপর বসলুম। সুতো কেটে সে চিঠি খুলে নিলে, তারপর আমাকে নিয়ে চল্লো প্রধান সেনাপতির কাছে। লোকটির চেহারা পাকা আমের মত, আর তার গা থেকে এমন সুন্দর সাবানের গন্ধ বার হচ্ছিল! সে অন্য সৈনিকদের মত নয়—সম্ভবত সে দিনে তিন চারবার সাবান মেখে স্নান করে। রিসালাদারের লেখা কাগজ পড়া শেষ হলে সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলো আর আনন্দিত ষাঁড়ের মত ঘোঁত ঘোঁত করতে লাগলো।"

পাঁচ

"রিসালাদারের আঘাত গুরুতর হয়নি। সে সেরে উঠতেই আমরা আবার যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হলুম। এবার হীরা আর আমি দুজনেই গেলুম। আমি তখনি বুঝলুম যে এবারকার খবর এত জরুরি যে তা নিয়ে যাবার ভার একজনকে না দিয়ে দুজনকেই দেওয়া হবে, যাতে অন্তত একজন ঠিক পৌছতে পারবে।

"বিষম শীত। মনে হচ্ছিল যেন বরফের রাজ্যে বাস করছি। অবিরাম বৃষ্টি চলছে। জমি এত নোংরা যে তার ওপর পা ফেললেই কাদায় পা জড়িয়ে যায়, যেন চোরাবালিতে পা পড়েছে; এমন ঠাণ্ডা, মনে হয় যেন মড়া মাড়িয়েছি!

"এবার আমরা এক অচেনা জায়গায় গিয়ে পৌছলুম। 'ট্রেঞ্চ' নয়—এ একটা ছোট গ্রাম। জ্বলন্ত ধ্বংসের ঢেউ তার চারদিকে আছড়াচ্ছে—ফেটে পড়ছে। লোকদের মুখের ভাব দেখে মনে হয়, এ একটি বিশিষ্ট ও পবিত্র স্থান, কারণ দেখছি এ জায়গা তারা ছাড়তে চায় না, যদিও এখানকার প্রত্যেক ছাত, দেওয়াল, আর গাছ মৃত্যুর রক্তজিভ চেটে চেটে নিচ্ছে। একটা খোলা জায়গায় থাকতে পেরে খুব আনন্দ হল। এখান থেকে ঘোলাটে আকাশ ভারি নীচু দেখাচ্ছে। তুষারে ঢাকা সাদা জমির টুকরোও দেখতে পাচ্ছি, সেখানে কামানের গোলা এখনো পড়েনি। গোলার ঘায়ে যেখানে সব চুর্ণ বিচুর্ণ হচ্ছে, বাড়ি-ঘর যেখানে ঝড়ে-পাখীর-বাসার-মত ধ্বসে পড়ছে, সেখানেও গেছো ইঁদুর গর্ত থেকে গর্তে ছুটোছুটি করছে, নেংটি পনীর চুরি করছে, মাকড়সা পোকা ধরবার জন্যে

জাল বুনছে। তাদের জীবনযাত্রা তারা নির্বাক করে চলেছে, যেন মানুষের হাতে মানুষের হত্যাকাণ্ড আকাশের মেঘের মতই তুচ্ছ।

"কিছুক্ষণ পরে বুম্‌বুম্‌ শব্দ থামলো। মনে হল সেই গ্রাম, অর্থাৎ সেই গ্রামের যেটুকু বাকি ছিল, এখন নিরাপদ; আর আক্রমণের ভয় নেই। ক্রমেই অন্ধকার বাড়তে লাগলো। আকাশ এত নীচে নেমে এসেছে যেন ঠোঁট দিয়ে ছুঁতে পারি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা, আমার পালকে পালকে স্যাঁতা ঢুকে যেন একটি একটি করে উপড়ে ফেলছে। খাঁচার মধ্যে স্থির হয়ে বসে থাকা একেবারেই অসম্ভব। গরম থাকবার জন্যে হীরা আর আমি পরস্পরকে জড়ামড়ি করে বসে রইলুম।

আবার কামান গর্জন শুরু হল। এবার প্রত্যেক দিক থেকে। আমাদের ছোট গ্রাম একটি দ্বীপের মত, তার চারদিকে শত্রু। কুয়াসায় যখন সমস্ত ঢাকা পড়েছিল সম্ভবত সেই সুযোগে শত্রু পিছন দিক থেকে আমাদের দলকে আলাদা করে ফেলেছে। এখন তারা হাউই ছাড়তে লাগলো। বড় জোর দুপুর পার হয়েছে, কিন্তু হিমালয়ের রাতের মত অন্ধকার। ভাবতে লাগলুম, এ যে বাত ছাড়া আব কিছু তা মানুষে বোঝে কি করে! হাজার হোক মানুষ পাখীর চেয়ে কমই জানে!

"চিঠি নিয়ে যাবার জন্যে হীরাকে ও আমাকে ছেড়ে দিলে। ওপবদিকে উড়লুম, কিন্তু বেশিদূর নয়, কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘন কুয়াসায় আমরা ঢাকা পড়লুম। চোখে কিছু দেখা যায় না। চোখের

ওপর যেন একটা ঠাণ্ডা চটচটে পাতলা পর্দা চেপে বসলো, এমনি কিছু আমিও আগে থেকেই প্রত্যাশা করেছিলুম। এমন অবস্থায়, ভারতবর্ষেই হোক আর যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক, যা করবার তাই করলুম, অর্থাৎ ওপরদিকে উড়লুম। মনে হল একেবারে যেন এক ফুটের বেশী যেতে পারি না। ডানা ভিজে গেছে। হাঁচির পর হাঁচি হচ্ছে—তার ধাক্কায় নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। মনে হল তখনি পড়ে মারা যাবো। এমন সময় পায়রার ঠাকুরের কৃপায় কয়েক গজ পর্যন্ত দেখতে পেলুম। তাই আরো ওপরে উঠলুম। চোখ টনটন করতে লাগলো। হঠাৎ বুঝলুম চোখের পরদা নামিয়ে দেওয়া দরকার—আমার দ্বিতীয় চোখের ঢাকা, যা আমি আঁধির মাঝে ওড়বার সময় ব্যবহার করি—অন্ধ হবার সাধ না থাকলে। আমরা কুয়াসার মধ্যে নেই—এ হচ্ছে ধোঁয়া। এই দুর্গন্ধ চোখ-নষ্ট-করা ধোঁয়া মানুষে বার করেছে। চোখ ব্যথা করছে—যেন কেউ তার মধ্যে ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে। চোখের পাতলা ঢাকা নামিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে আঁকুপাঁকু করে ওপরে উঠতে লাগলুম। হীরা সঙ্গে আসছিল, সেও উঠলো। সেই গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে সে মারা যাবার জোগাড়। তবুও সে ওড়া বন্ধ করবে না। শেষে আমরা সেই বিষাক্ত ধোঁয়ার পাত ছাড়িয়ে উঠলুম। বাতাস এখানে নির্মল, চোখের পর্দা সারাতে দেখলুম অনেক দূরে ধোঁয়াটে আকাশের গায়ে আমাদের সৈন্যদল। আমরা সেইদিকে উড়ে চল্লুম।

"আধ পথ যেতে না যেতে একটা ভয়ানক 'ঈগল'—তার সর্বাঙ্গে কালো কালো ক্রুশ চিহ্ন—কাছাকাছি উড়ে এসে আমাদের দিকে

অগ্নিবর্ষণ সুরু করলে—পাক্-পাফ, পাক্-পাফ, পপ্-পা…ডুব মেরে যথাসাধ্য করলুম। মুখ ফিরিয়ে তার পিছনপানে উড়ে গেলুম, সেখানে যন্ত্রটা আমাদের মারতে পারে না। সেই কলের ঈগলের লেজের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি—একবার ভেবে দেখ! সে কিছুই করতে পারে না! সে ঘুরতে লাগলো, আমরাও তাই করলুম। সে ডিগবাজী খেলে, আমরাও তেমনি করলুম! লেজ না নাড়িয়ে কিছুই করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আসল ঈগলের সঙ্গে তার তফাৎ হচ্ছে—এর লেজ মরা মাছের মত শক্ত অনড়। আমরা বুঝতে পেরেছিলুম, আর একবার যদি তার সামনে গিয়ে পড়ি তবে তখনি মারা পড়বো।

"সময় যায়। বুঝলুম সেই কলের ঈগলের লেজের ওপর বরাবর থাকতে পারবো না। পিছনে বিষাক্ত গ্যাসে ঢাকা যে গ্রাম ফেলে এসেছি সেখানে রিসালাদার আর আমাদের বন্ধুরা রয়েছে। তাদের সাহায্য করে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে খবর পৌছে দিতে হবেই!

"ঠিক সেই সময়ে কলের ঈগল একটা চালাকি খেল্লে। সেটা তার বাড়িমুখো ফিরে যেতে লাগলো! তার লেজের ওপর উড়তে উড়তে শত্রুর আড্ডার মধ্যে গিয়ে বন্দুকের গুলিতে মরবার ইচ্ছা হল না। এখন আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় আধাপথে এসে পড়েছি —আমাদের আড্ডাও দেখা যাচ্ছে, আর অত সাবধান হওয়ার দরকার নেই। কলের ঈগলকে ছেড়ে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি উড়তে লাগলুম। ডানার ঘায়ে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠছি দেখে

সেই পাজি জানোয়ারটা মুখ ঘুরিয়ে আমাদের পিছু নিলে। ভাগ্যক্রমে তার একটু সময় লাগলো। এখন আর সন্দেহ নেই, আমাদের সৈন্যদলের ছাউনির ওপর দিয়ে উড়ছি। তবুও সেই কলের পাখীটা আমাদের সমান সমান উঠে আমাদের ওপর অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলো—পাফ্-পাফ-পপা। এঁকে বেঁকে ডুব মেরে চলতে বাধ্য হলুম। হীরাকে আমার তলায় ওড়ানোতে সে রক্ষা পেলে। এমনি করে উড়ছি, কিন্তু কপাল যাবে কোথা? কোথা থেকে আর একটা 'ঈগল' এসে শত্রুর দিকে গোলা ছুঁড়তে লাগলো। এবার আমরা নিরাপদ বোধ করে পাশাপাশি উড়ছি, এমন সময় একটা গুলি আমার পাশ দিয়ে হুস্ করে গিয়ে তার ডানা দিলে ভেঙে। বেচারা হীরা! সে ঘুরপাক খেয়ে শূন্যের মাঝ দিয়ে পড়লো একখানা রূপার পাতের মত—ভাগ্যক্রমে আমাদের সৈন্যদলের মাঝেই। সে মরলো দেখে আমি বিদ্যুদ্বেগে উড়লুম—সেই দুই 'ঈগলের' লড়াই দেখবার জন্যে একবারও ঘাড় ফেরালুম না।

"বাড়ি পৌঁছুলে তারা আমাকে প্রধান সেনাপতির কাছে নিয়ে গেল। সে আমার পিঠ থাবড়ে দিলে। সেই প্রথম আমি বুঝতে পারলুম কী দরকারি খবর আমি এনেছি; কারণ, বুড়ো সেই কাগজের টুকরো পড়েই কতকগুলো অদ্ভুত টক্-টক্-শব্দ-করা জিনিস ছুঁলে, তারপর এক-টুকরো শিং তুলে নিয়ে তার মধ্যে হাউ-হাউ করে কি বলতে লাগলো। এবার ঘণ্ডালু আমাকে আমার বাসায় নিয়ে গেল। সেখানে বসে হীরার কথা ভাবতে ভাবতে মনে হল যেন আমার তলায় পৃথিবী দুলছে। কলের ঈগল আকাশে

পঙ্গপালের মত ঘন হয়ে উড়ছে। কখনো গর্জন করছে, কখনো ভিরর্ করছে, কখনো ঘেউ ঘেউ করছে। নীচে জমি থেকে ধাতুর তৈরি অসংখ্য কুকুর বুম্বুম্ শব্দ করছে, গোঁ গোঁ করছে। তারপর এল প্রকাণ্ড আগুন-ছেটানো কলের গম্ভীর হুঙ্কার—যেন এক-জঙ্গল বাঘ খেপে গেছে! ঘণ্ড্ আমার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বল্লে—আজকের দিন তুমিই রাখলে! কিন্তু দিন ত চোখে পড়ে না। অন্ধকার ঘোলাটে আকাশ, তার তলে মৃত্যু 'ড্রাগনের' মত পাক খাচ্ছে, চীৎকার করছে আর তার নাগপাশে সমস্ত পিষে ফেলছে। ব্যাপার কী বিষম শোনো একবার! পরদিন সকালে আমাদের ছাউনির ওপর যখন উড়লুম তখন দেখি আমার বাসার বড় জোর আধকোশের মধ্যে কামানের গোলা জমি চষে ফেলেছে। এমন কি ছোট বড়ো ইঁদুরগুলোও পার পায়নি—অনেক ইঁদুর মারা পড়েছে—টুকরো টুকরো হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে। কী ভয়ানক? এমন দুঃখ হতে লাগলো! হীরা মারা গেছে, আমি এখন একা—শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন।"

ছয়

পৌষ মাসের কাছাকাছি ঘণ্ডালু আর চিত্রগ্রীবকে সন্ধানীর কাজে পাঠানো হল। যে জায়গায় তারা গেল সেটা একটা জঙ্গল—Ypres, Armentieres ও Hasbrouck থেকে বেশি দূরে নয়। ফ্রান্সের ম্যাপ্ নিয়ে Calais থেকে দক্ষিণে যদি একটা সোজা লাইন টানো তবে কতকগুলো জায়গাতে পৌঁছবে যেখানে ইংরেজ আর ভারতীয় সেনাদল আস্তানা গেড়েছিল। Armentieresএর কাছে ভারতীয় মুসলমান সৈনিকের অনেক কবর দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু সেনাদের মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলেছে। তাদের ভস্মাবশেষ বাতাসে উড়ে গেছে—তাদের স্মৃতির ভার বা চিহ্ন কোথাও নাই।

ঘণ্ডালু আর চিত্রগ্রীবকে Hasbrouckএর কাছে এক জঙ্গলে পাঠানো হল। উদ্দেশ্য—মাটির তলে একটা প্রকাণ্ড গুলিবারুদের গুদাম আবিষ্কার করা। Hasbrouck শত্রুর পিছনদিকে। গুদাম আবিষ্কার হলে ঘণ্ডালু আর চিত্রগ্রীব, একত্রে বা আলাদা আলাদা, সে-জায়গার একটি নিখুঁত ম্যাপ নিয়ে ইংরেজ সৈন্য-সদরে ফিরে আসবে। ব্যাপার এই। পৌষ মাসের এক নির্মল সকালে চিত্রগ্রীবকে এয়ারোপ্লেনে চাপিয়ে নিয়ে গেল। একটা জঙ্গলের উপর দিয়ে প্রায় দশক্রোশ পথ এয়ারোপ্লেন্ উড়লো, তার খানিকটা ভারতীয় সেনাদলের দখলে, আর খানিকটা জার্মানদের দখলে। জার্মানদের অধিকৃত অংশ পার হবার পর চিত্রগ্রীবকে ছেড়ে দেওয়া হল। সমস্ত জঙ্গলটার উপরে সে ঘুরে বেড়ালে, তারপর জায়গাটার প্রকৃতি কতকটা বুঝে সে বাড়ি ফিরে গেল। এমন করার উদ্দেশ্য—

চিত্রগ্রীব পথ চেনে কি না, আর তার কর্তব্য বোঝে কি না, তা পরীক্ষা করে নেওয়া।

সেদিন বিকালে সূর্য অস্ত যাবার পর (এ জায়গায় প্রায় বেলা চারটের সময় সূর্যাস্ত হয়) ঘণ্ডালু রীতিমত গরম পোষাক পরে তার কোটের তলায় চিত্রগ্রীবকে লুকিয়ে নিয়ে রওনা হল। 'অ্যাম্বুল্যান্সে' চড়ে সেই প্রকাণ্ড বনের ভিতর দিয়ে তারা ভারতীয় সেনাদলের দ্বিতীয় 'লাইন' পর্যন্ত গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে গোয়েন্দা-বিভাগের কয়েকজন লোক তাদের পথ দেখিয়ে চল্লো।

শীঘ্রই তারা এসে পৌছলো "No man's Land" বা এমন এক জায়গায় যাকে বেওয়ারিশ বলা চলে। ভাগ্যক্রমে সেখানটা গাছে ঢাকা—সেগুলো কামানের গোলায় তখনো ধ্বংস হয়নি। ঘণ্ডালু ফরাসী বা জার্মান ভাষা জানে না, ইংরেজিতে তার জ্ঞান "yes"—'হাঁ' "no"—'না', ও "Very well"—'বেশ' পর্যন্ত। তারই এখন কাজ হল জঙ্গলে জার্মানদের গোলাবারুদের গুদাম খুঁজে বার করা। সঙ্গে কেবল তার একটি পায়রা—সে-ও কোটের তলায় গভীর ঘুমে অচেতন।

সর্বপ্রথমে তাকে ভেবে নিতে হল সে যেখানে এসেছে সে জায়গাটির আবহাওয়া শীতের হিমালয়ের মত। সেখানে শীতকালে গাছে পাতা থাকে না, আর জমির উপর থাকে শরতের শুকনো পাতা আর তুষার। ছোট বড় গাছে পাতা নাম মাত্র, সেখানে আত্মগোপন সহজ নয়। অন্ধকার রাত ঠাণ্ডা যেন মড়া, কিন্তু অন্ধকারে আর কোন লোক তার মত দেখতে পায় না, আর তার

আঘ্রাণ-বোধের তীক্ষ্ণতা সকল জন্তুর বাড়া—এই সব কারণে সেই "No man's Land" বা বেওয়ারিশ দেশে পথ চলা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হ'ল না। ভাগ্যক্রমে সেদিন রাত্রে বাতাস বইছিলো পূর্বদিক থেকে।

গাছের গুড়ির মাঝ দিয়ে সে যথাসম্ভব দ্রুতগতি চলতে লাগলো। একদল জার্মান সেই পথে আসচে—সে খবর তারা পৌঁছবার কয়েক মিনিট আগেই নাকের সাহায্যে সে জানতে পারলে। চিতাবাঘের মত একটা গাছ বেয়ে উপরে উঠে সে বসে রইলো। এতটুকু শব্দও তাদের কানে গেল না। দিনের বেলা হ'লে তারা তাকে আবিষ্কার করতো, কারণ ঠাণ্ডায় জমাট জমির উপর দিয়ে খালি পায়ে চলায় পা থেকে রক্ত বার হ'য়ে পিছনে তার স্পষ্ট চিহ্ন রেখে যাচ্ছিল।

একবার সে একটুর জন্য বেঁচে গেল। একটা গাছে উঠে ডালের উপর সে তখন বসেছে, তলা দিয়ে চলেছে দুজন জার্মান শান্ত্রী, এমন সময় সে শুনতে পেলে কাছের ডাল থেকে কে যেন তার কানে কানে ফিস ফিস করে করে কথা বল্লে। সে তখনি বুঝতে পারলে একজন জার্মান বন্দুকধারী। কিন্তু সে তার মাথা নীচু করে শুনতে লাগলো। জার্মান বল্লে, "Guten nacht" বা 'গুড নাইট্', তারপর তাকে ডিঙিয়ে গাছ বেয়ে নেমে গেল। নিশ্চয়ই সে ভেবেছিল, ঘণ্ডালু তাদেরই একজন সৈনিক, তার বদলি হ'য়ে এসেছে। কিছুক্ষণ পরে ঘণ্ডালুও নামলো, তারপর সেই জার্মানের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে চল্লো। (মানুষের পায়ের চাপে

জমি যেখানে যেখানে নেমে গেছে, অন্ধকার হলেও খালি পায়ে সে তা অনুভব করতে লাগলো।)

অবশেষে সে এক জায়গায় এসে পৌঁছলো, সেখানে অনেক লোক সজাগ অবস্থায় রাত কাটাচ্ছে। চুপি চুপি তাদের এড়িয়ে একটু তফাৎ দিয়ে চলেছে, এমন সময় ঠিক পায়ের কাছে একটা অদ্ভুত শব্দ। থমকে দাঁড়িয়ে সে শুনতে লাগলো—ঠিক, শব্দটা চেনা। সে অপেক্ষা করতে লাগলো—জন্তুর পায়ের আওয়াজ—প্যাটার্ প্যাট, পাট্যার্ র্! ঘণ্ডালু শব্দটার পানে এগিয়ে যেতেই একটা চাপা গর্জন বার হল। ভয়ের বদলে তার মন খুসি হয়ে উঠলো—ভারতবর্ষের বাঘেভরা জঙ্গলে যে কত রাত কাটিয়েছে সে একটা বুনো কুকুরের গর্জনে কি ভড়কে যাবে? শীঘ্রই সে দেখতে পেলে একজোড়া লাল চোখ। ঘণ্ডালু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সামনের বাতাস সাবধানে শুঁকে দেখলে, কিন্তু সেই কুকুরটার আশপাশে মানুষের গন্ধ একটুও পেলে না—জন্তুটা বুনো হয়ে গেছে। কুকুরটাও বাতাস শুঁকতে লাগলো—বোঝবার জন্য কি রকম প্রাণীর সামনে সে দাঁড়িয়ে; কারণ, সাধারণত মানুষের গায়ে যে ভয়ের গন্ধ, ঘণ্ডালুর গা থেকে সে গন্ধ বার হচ্ছে না। সে এগিয়ে এসে তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শুঁকতে লাগলো। ভাগ্যক্রমে ঘণ্ডালু চিত্রগ্রীবকে কুকুরটার নাকের উপর ধরে ছিল, সেজন্য পায়রার গন্ধ বাতাসে উপরদিকে ভেসে গেল, বুনো কুকুরটা সামনের মানুষের মধ্যে একটি সাহসী জীব ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না। সে তার শত্রু নয় বুঝতে পেরে লেজ নেড়ে নেড়ে কুকুরটা কেঁউ কেঁউ

করতে লাগলো। ঘণ্ডালু তার মাথা হাত দিয়ে না থাবড়ে আস্তে আস্তে হাতখানা তার চোখের সামনে ধরলে—শুঁকে দেখুক। মুহূর্তের জন্য ভাবনা হল—কুকুরটা তার হাত কামড়াবে না কি? আর এক মুহূর্ত কাটলো। তারপর···কুকুরটা সেই হাত চাটতে স্থুরু করে দিলে। ঘণ্ডালু আপনমনে বলতে লাগলো—"দেখছি শিকারির কুকুরটার মালিক নেই—সম্ভবত সে মারা পড়েছে! হতভাগা জন্তুটা নেকড়ের মত বুনো হয়ে গেছে। জার্মান সেনার খাবার লুট করে এ প্রাণধারণ করে, কারণ দেখতেই পাচ্ছি, মানুষের মাংস এ এখনো খায়নি! ভালোই হল।"

ঘণ্ডালু আস্তে আস্তে শিস্ দিলে—সকল যুগের সকল দেশের শিকারীর ডাক। তার মানে এগিয়ে পথ দেখাও। কুকুরটা পথ দেখিয়ে চল্লো। জার্মান সেনাদের সমস্ত আড্ডা সে সাবধানে এড়িয়ে চল্লো হরিণ যেমন করে বাঘের আস্তানা এড়িয়ে চলে। আর সন্দেহ নাই; ঘণ্ডালু ঠিক সেই খুঁজে পেয়েছে, কেবল গুলিবারুদের নয়—জার্মানদের রসদেরও। তার নায়ক সেই বুনো কুকুর মাটিতে এক গুপ্ত গর্তের মাঝে ঢুকে গেল, তারপর আধঘণ্টা পরে একটা বড়ো বাছুরের ঠ্যাং কামড়ে ধরে বেরিয়ে এল। সেটা যে গোমাংস তা ঘণ্ডালু গন্ধ থেকেই বুঝতে পারলে। ঠাণ্ডা মাটির উপর কুকুরটা খেতে বসলে মানুষটা জুতো পরতে স্থুরু করলে—সাত রাত যে-জুতো সে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে বেড়িয়েছে। তারপর সে মুখ তুলে দেখতে লাগলো। তারাগুলো দেখে সে বলতে পারে সে কোথায় আছে। সেখানে সে কিছুক্ষণ রইলো।

আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুটতে দেখে সে পকেট থেকে একটা কম্পাস্ বার করলে। তার স্থির বিশ্বাস এ জায়গার একটা ম্যাপ্ সে আঁকতে পারে। ঠিক সেই সময় কুকুরটা লাফিয়ে উঠে দাঁত দিয়ে ঘণ্ডালুর কোট চেপে ধরলে। নিশ্চয়ই জন্তুটা আবার তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সে আগে আগে দৌড়লো, আর ঘণ্ডালু তেমনি তাড়াতাড়ি তার অনুসরণ করলে। শীঘ্রই তারা একস্থানে পৌছুলো যেখানে হিমে-জমা আঙুরের লতা আর কাঁটা এমন ঘন হয়ে উঠেছে যে তার মাঝ দিয়ে কেবল জন্তুরই চলা সম্ভব। কুকুরটা একরাশ ধারালো কাঁটার তলা দিয়ে গুড়ি মেরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন ঘণ্ডালু, তারাগুলো আর কম্পাসের নির্ভুল অবস্থান দেখিয়ে নক্সা এঁকে চিত্রগ্রীবের পায়ে সেগুলো বেঁধে তাকে ছেড়ে দিলে। সে দেখতে লাগলো, পায়রাটা গাছ থেকে গাছে উড়ে উড়ে বসছে, প্রত্যেকটার উপর মিনিট খানেক বসে ঠোঁট দিয়ে তার ডানা সাফ করছে। তারপর সে পায়ে-বাঁধা চিঠিটা ঠোকরাতে লাগলে—হয়ত পরখ করে দেখছিল বাঁধন বেশ শক্ত আছে কি না। তারপর সে সবচেয়ে উঁচু গাছের ডগায় গিয়ে বসে সেখান থেকে জায়গাটা বেশ করে দেখতে লাগলো। ঘণ্ডালু উপরপানে চেয়ে ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে বোধ হল কি যেন তাকে টানছে। চোখ নামিয়ে পায়ের দিকে চেয়ে দেখলে কুকুরটা তাকে কাঁটাঝোপের তলায় একটা গর্তের দিকে টানছে। যেই নীচু হয়ে সেই পথে যাবার উপক্রম করেছে অমনি মাথার উপরে ডানার ঝটপট শুনতে পেলে,

তারপরেই বন্দুকের আওয়াজ। চিত্রগ্রীব মারা গেল কি না দাঁড়িয়ে উঠে তা সন্ধান করবার ইচ্ছা তার হল না। কাঁটার তলায় গুড়ি মারতে মারতে শেষে মনে হল তার পেট যেন পিঠের সঙ্গে আঠা দিয়ে আঁটা, আর দু-ই যেন মাটির সঙ্গে শক্ত করে সেলাই-করা। বুকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে সে এগুতে লাগলো, শেষে হঠাৎ সে নীচু দিকে পিছলে গিয়ে প্রায় আটফুট নীচে এক অন্ধকার গহ্বরে পড়লো। ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিন্তু প্রথমে তা ঘণ্ডালুর চোখে পড়লো না; কারণ, মাথায় চোট লেগেছে, সে তখন তাতে হাত বোলাতে ব্যস্ত।

শেষে কোথায় রয়েছে ভাবতে ভাবতে সে বুঝতে পারলে, একটা জমে-যাওয়া কূপের মধ্যে সে বসে—সেটা চোর-ডাকাতের আড্ডার মত দুর্ভেদ্য কাঁটা-ঝোপে ঢাকা। শীতকালে যখন মাথার উপরের লতায় বা শাখায় পাতা থাকে না, তখনো দিনের বেলা সেখানে গভীর অন্ধকার। কুকুরটা সঙ্গেই আছে, মনে হচ্ছে সে ঘণ্ডালুকে সেখানে নিরাপদ করার জন্যই এনেছে। বেচারা জানোয়ারটা বন্ধুর সঙ্গ পেয়ে এত খুসি যে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারই সঙ্গে খেলা করতে চায়। কিন্তু ঘণ্ডালুর ভারি ঘুম পেয়েছিল, তাই কাছেই কামানের শব্দ হতে থাকলেও সে গভীর ঘুমে মগ্ন হল।

প্রায় ঘণ্টাতিনেক পরে কুকুরটা হঠাৎ কেঁউ কেঁউ করে উঠলো, তারপর আর্তনাদ করতে লাগলো যেন খেপে গেছে। তারপর ভয়ানক আওয়াজের ধাক্কায় পৃথিবী দুলে উঠলো। তা সহ্য করতে না পেরে জন্তুটা ঘণ্ডালুর কোটের হাতা ধরে টানতে লাগলো।

বিস্ফোরনের আওয়াজ স্তরে স্তরে উঠছে, শেষে যেখানে ঘণ্ডালু ছিল, সেই জায়গায় শিশুর দোলার মত দোলানি সুরু হল, তবুও সে সেই গুপ্তস্থান ত্যাগ করলে না। সে আপনমনে কেবল বল্লে— "চিত্রগ্রীব! তোমার আর জুড়ি নেই, তোমার কাজ খাসা করেছ! এরি মধ্যে 'চেরি'-মুখো সেনাপতির কাছে চিঠি পৌছে দিয়েছ— ভীষণ শব্দে এই যে তার জবাব আসছে! পাখীর মাঝে তুমি হলে মাণিক!" এমনি সব বিড়বিড় করে সে বকে চল্লো যখন এয়ারোপ্লেন্ থেকে বোমা পড়ে জার্মানদের বারুদের গাদায় আগুন ধরিয়ে দিলে।

কুকুরটা এতক্ষণ তার কোটের হাতা ধরে তাকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। এবার সে কোঁ-কোঁ করে কাঁপতে লাগলো, খুব জ্বর হলে লোকে যেমন করে কাঁপে। আর ঠিক তখনি কি একটা শূন্য ভেদ করে ছুটে এসে কাছেই ধপ করে পড়লো। মরিয়া হয়ে চীৎকার করে বেচারা কুকর গুপ্তস্থানে থেকে হুস্ করে ছুটে বার হল। ঘণ্ডালুও তার অনুসরণ করলে—কিন্তু বৃথা! কারণ কাঁটা-ঝোপের তলায় অর্দ্ধেক পথ গুড়ি মেরে যেতে না যেতেই একটা ভীষণ আওয়াজ হল—মনে হল পায়ের তলার জমি যেন সরে গেল—একটা তীব্র বেদনা তার কাঁধ ফুঁড়ে ফেল্লে। মনে হল যেন একটা দানব তাকে ওপরে ছুড়ে দিয়ে আবার মাটির ওপর সজোরে আছড়ে ফেল্লে। তার চোখের সামনে লাল চুণির মত অসংখ্য আলো যেন নাচতে লাগলো— তারপর সব অন্ধকার।

এক ঘণ্টা পরে জ্ঞান হলে প্রথম জিনিষ যা তার বোধগম্য হল, তা হচ্ছে হিন্দুস্থানী কথাবার্তার শব্দ। দেশের ভাষা আরো স্পষ্ট করে শোনবার উদ্দেশ্যে সে মাথা তোলবার চেষ্টা করলে। অমনি এক মারাত্মক বেদনা—হাজার কেউটের কামড়ের মতন। এখন আর তার মনে সন্দেহ নাই যে সে আঘাত পেয়েছে—হয়ত এমন আঘাত, যার ফলে তার মৃত্যু হতে পারে। তবুও যখনি কাছে হিন্দুস্থানী ভাষা শোনে তখনি মন খুসি হয়ে ওঠে, কারণ তার দ্বারা বোঝা যায়, এখন বনটা ভারতীয় সেনার অধিকারে—শত্রুর দখলে নয়। আপন মনে সে বল্লে, যাক, আমার কাজ শেষ হয়েছে! এখন শান্তিতে মরতে পারি!

সাত

"যেদিন এত সব ব্যাপার ঘটলো তার আগের রাতে আমি অতি সামান্যই ঘুমিয়েছিলুম। ঘণ্টালুর কোটের তলায় থাকলেও সে জানতে পারেনি যে আমি জেগে আছি। যে-লোক হরিণের মত ছোটে, কাঠবিড়ালের মত গাছে চড়ে বা আধ ঘণ্টা অন্তর অচেনা কুকুর সঙ্গে জোটায়, তার বুকের ওপর কি আর ঘুমুনো সম্ভব... মাঝে মাঝে ঘণ্টালুর বুকের মধ্যে এমন শব্দ হচ্ছিল যে তফাৎ থেকেও তা শোনা যায়। তাঁর আর এক কাজের জন্যে এত কাছে থাকার দরুণ ঘুমের ব্যাঘাত ঘটলো—সারারাত তার অনিয়ন্ত্রিত শ্বাসপ্রশ্বাস। কখনো তার নিশ্বাস দীর্ঘ, কখনো সে হাঁপায় বিড়ালের তাড়ায় ইঁদুরের মত। এমন লোকের জামার তলায় ঘুমুনোও যা, আকাশে ঝড়ের ওপর ঘুমুবার চেষ্টা করাও তা!"

"তারপর সেই কুকুরটা! তাকে কি কোনোকালে ভুলবো? ঘণ্টালু যখন তাকে সঙ্গে নিলে তখন ভয় পেয়েছিলুম, কিন্তু সে আমার গায়ের গন্ধ পায়নি। তা ছাড়া নীচে থেকে যে বাতাস উঠছিল তা থেকে বুঝলুম যে, যে কারণেই হোক, কুকুরটা ভূত হলেও তার গায়ে দুর্গন্ধ নেই, আর সে আমাদের সাহায্য করতেই এসেছে। তার পদক্ষেপ সারা জীবন আমার মনে থাকবে। বেড়ালের মত নিঃশব্দে সে চলেছিল। কুকুরটা নিশ্চয়ই বুনো, কারণ যে-সব কুকুর সভ্যতার মাঝে বাস করে তারা শব্দ করে বেশি। তারা ধীরেসুস্থে চলতেও পারে না। মানুষের সঙ্গদোষ এমনি; মানুষের সঙ্গে থাকার ফলে বেড়াল ছাড়া প্রত্যেক জন্তুই অসাবধানী আর অশান্ত

হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কুকুরটা ভাহা বুনো। সে নিঃশব্দে চলে, নিঃশব্দে নিশ্বাস ছাড়ে। তবে কেমন করে জানলুম সে সঙ্গে আছে? মাটি থেকে যে গন্ধ আমার নাকে আসছিল তাই থেকে।



"বিনা ঘুমে অতি কষ্টে রাত কাটবার পর ঘণ্ডালু আমাকে ছেড়ে দিলে। কোথায় যে আমাকে ছাড়লে চিনতেই পারি না। তাই

গাছ থেকে গাছে উড়ে কোথায় আছি বোঝবার চেষ্টা করলুম, তার ফলে ভয় যেন হাড়ে হাড়ে গিয়ে ঢুকলো। কারণ তখন দিনের আলো ফুটছে, গাছগুলো অসংখ্য চোখে ভর্তি হয়ে উঠেছে। অচেনা নীল চোখ নলের মাঝ দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। চোখের পিছনে মানুষ; একজন, আমি যেখানে বসেছি তা থেকে হাতখানেক দূরে গাছের চূড়ায় বসে দেখছিল। সে আমার আসার শব্দ পায়নি, কারণ আমাদের চারিদিকে ধাতুর তৈরি কুকুরগুলো ডাকছিল —পাফ্ পা পা পা প্যাক্!"

"কিন্তু যখন আমি ওপরে উড়লুম তখন সে আমাকে দেখতে গেলে। আমার মনে হল তাড়াতাড়ি অন্য গাছের তলায় না লুকোলে সে আমাকে গুলি করবে, আর সে অনেকবার বন্দুক ছুঁড়েও ছিল, কিন্তু আমি তখন সন্ন্যাসীর জটার মত ঘন এক আগাছার পিছনে লুকিয়েছি। স্থির করলুম গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে চলবো, বিপদের সম্ভাবনা দূর না হওয়া পর্যন্ত উড়বো না। এমনি করে আধ মাইল পথ যেতে বড়ো কম সময় লাগেনি। শেষে পায়ে খিল্ ধরে আসতে লাগলো, তখন ঠিক করলুম উড়বো—বিপদ আসুক আর নাই আসুক।"

"ভাগ্যক্রমে কেউ আমাকে ওপরে উড়তে দেখেনি। শূন্যে বড়ো বড়ো বৃত্ত রচনা করে আমি উঁচুতে উঠলুম। সেখান থেকে বনটাকে আগাছার মত ছোট দেখাতে লাগলো। চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলুম। অনেক দূরে পূবদিকে সকালের আকাশের গায়ে এক ঝাঁক এয়ারোপ্লেন্ উড়ছে সোণার রথের মত। তার

মানে আমি যদি সেখানে বেশিক্ষণ থাকি তবে শত্রু এসে পড়বে আমার ঘাড়ে। তাই পশ্চিম দিকে রওনা হলুম, অমনি গাছের মাথা থেকে হাজার বন্দুকধারী আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে লাগলো।

"আমার মনে হয়, যখন আমি ঘুরে ঘুরে তাদের গাছের ওপর দিয়ে উঠছিলুম, তখন জার্মানরা ঠিক জানতো না আমি তাদের হরকরা কি না; কিন্তু যেই বন্দুকধারীরা দেখলে আমি পশ্চিমে চলেছি, অমনি তারা নিঃসন্দেহে বুঝলে আমি তাদের দলের নই; তখন তারা আমাকে মেরে, পায়ে বেঁধে কি নিয়ে চলেছি, দেখবার জন্যে আমার দিকে গুলি চালাতে লাগলো।

"পরিষ্কার শীতের বাতাসে না জমে গিয়ে আমি কিন্তু বরাবর উঠে যেতে পারি না, তা ছাড়া শত্রুর এয়ারোপ্লেন্ আমার নাগাল ধরে, আমায় ইচ্ছে নয়। আবার আমি পশ্চিমদিকে ধাবিত হলুম, আবার গুলির দেওয়াল মরণের কাঁটার মত আমার সামনে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু আমার তখন পছন্দের অবসর নেই; হয় সেই দেওয়াল ফুঁড়ে পথ করা, নয় এয়ারোপ্লেনের হাতে মরা—সেগুলো তখন এত কাছে এসে পড়েছে যে তাদের আরোহীদের দেখতে পাচ্ছিলুম। তাই পশ্চিমপানেই ছুটলুম। ভাগ্যক্রমে এখন আমার লেজ, যাতে মাসখানেক আগে আঘাত লেগেছিল, প্রায় তার স্বাভাবিক আয়তন ফিরে পেয়েছে। সেই লেজের হাল না থাকলে আমার কাজ ছুওণো শক্ত হ'ত। যতই আমাদের সৈন্যশ্রেণীর দিকে এগুচ্ছি, গুলিবর্ষণ ততই বাড়ছে। এখন আর সন্দেহ নেই সমস্ত বন্দুকধারী

আর দূর থেকে 'ট্রেঞ্চ'এর লোকেরা আমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছাড়ছে। সেই গুলির ঝাঁককে ফাঁকি দেবার জন্যে যত রকমের কায়দা জানা ছিল সবই প্রয়োগ করতে লাগলুম—আঁকাবাঁকা ওড়া, চক্রাকারে ওড়া, ডিগবাজি খাওয়া এমনি কত কি। কিন্তু তাই করতে গিয়ে সময় নষ্ট হল, সেই অবসরে একটা এয়ারোপ্লেন্ আমার মত ছোট জীবকেও মারবার মত কাছে এসে পড়ে ওপর ও পিছন থেকে গাদা গাদা আগুন ঢালতে সুরু করে দিলে। এখন আর সামনে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, তাই ছুটে চল্লুম। ওঃ কী তাড়া-তাড়িই আমি উড়ছিলুম—একেবারে যেন কালবোশেখীর ঝড়! তারপর—ফটাফট্—আমি আহত হলুম। পা'টা ঠিক কুঁচকির কাছে ভেঙে গেল। চিঠি-সমেত সেই ভাঙা পা আমার তলায় লটপট করতে লাগলো বাজের থাবায় আটকানো চড়ুইয়ের মত। ওঃ সে কী যন্ত্রণা! কিন্তু তা ভাববার অবসর কই, কারণ সেই এয়ারোপ্লেন্ এখনো ধাওয়া করে আসছে—আমি আগের চেয়েও তাড়াতাড়ি উড়তে লাগলুম।

"অবশেষে আমাদের সৈন্যশ্রেণী নজরে পড়লো। আমি নীচু পানে পালালুম। যন্ত্রটাও ডুব দিলে। ডিগবাজি খাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু পারলুম না। পায়ের জন্যে আমার কোনো কায়দাই দেখানো সম্ভব নয়। তারপর পা—পা—পাট্-পাটাট্—আমার লেজে আঘাত লাগলো, ঝরঝর্ করে পালক খসে পড়লো, মুহূর্তের জন্য জার্মান ট্রেঞ্চের লোকদের দৃষ্টি বাধা পেল। তাই আমি আমাদের সৈন্যশ্রেণীর দিকে গড়িয়ে গিয়ে একটা বৃত্ত রচনা করে

পার হয়ে গেলুম। তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়লো—আমাদের সৈন্যেরা এয়ারোপ্লেনকে মেরেছে। সেটা টলতে লাগলো, কাত হল, তারপর পড়লো। কিন্তু জ্বলতে জ্বলতে পড়ে যাবার আগে যতদূর অপকার করবার তা করলে—আমার ডান পাখা গুলির ঘায়ে ভেঙে দিয়ে গেল। উড়তে উড়তে আগুন লেগে সেটাকে পড়তে দেখে তৃপ্তি হলেও আমার যন্ত্রণা বেড়ে গেল, মনে হল কুড়িটা শিকরে যেন আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছে! যাই হোক, আমার জাতের ঠাকুরের কৃপায় বেদনা বা আনন্দবোধের শক্তি আমার লুপ্ত হয়ে গেল, বোধ হল যেন পাহাড়-প্রমাণ ভার আমাকে নীচু দিকে টানছে ; কেবলই টানছে···

"পায়রা-হাঁসপাতালে তারা আমাকে একমাস রেখে দিলে। আমার ডানা মেরামত হল, ভাঙা পা-ও যথাস্থানে সেলাই হল, তবুও আমি আর উড়তে পারলুম না। যতবারই শূন্যে লাফিয়ে উঠি ততবারই, কেমন করে জানি না আমার কাণ বন্দুক-কামানের ভয়ানক শব্দে ভরে যায়, চোখও জ্বলন্ত গোলাগুলি ছাড়া কিছুই দেখে না! অমনি ভয়ে মাটিতে হুস্ করে নেমে আসি। তুমি হয়ত বলবে আমি কাল্পনিক বন্দুকের শব্দ শুনছিলুম আর কাল্পনিক গোলাগুলির দেওয়াল দেখছিলুম ; হতে পারে, কিন্তু আমার ওপর তার প্রভাব আসল জিনিষের মতই হয়েছিল। আমার ডানায় পক্ষাঘাত হল, ভয়ে আমার নাড়িভুঁড়ি জমে গেল।

"তা ছাড়া ঘণ্ডালু না থাকলে আমি উড়বো না! যে-লোকের

গায়ের রং মেটে নয় আর যার চোখ নীল, তার হাত থেকে আমি উড়বো কেন? আগে তো তেমন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়নি! আমরা পায়রারা যে-কোনো অজানা লোকের বশ হই না। অবশেষে তারা আমায় খাঁচায় পুরে যে-হাঁসপাতালে ঘণ্ডালু ছিল সেখানে নিয়ে গিয়ে তার পাশে রেখে দিলে। তাকে দেখে যেন আর চেনা যায় না, কারণ তার চোখে—ঘণ্ডালুর চোখে—স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন! হ্যাঁ, সে-ও এই একবার দারুণ ভয় পেয়েছে। ভয় যে কি তা আমি জানি, সব পশু-পাখীই জানে; ঘণ্ডালুর জন্যে দুঃখ হল।

"কিন্তু আমাকে দেখে তার চোখ থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে গেল—আনন্দের আলোয় তা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, সে বিছানায় উঠে বসলো, আমাকে হাতে তুলে নিলে, আর আমার যে-পায়ে তার চিঠি বাঁধা ছিল, সে পায়ে চুমো খেলে। তারপর সে আমার ডান পাখায় হাত বুলিয়ে বল্লে—ভয়ানক যন্ত্রণা সত্ত্বেও তুমি তোমার মালিককে তার চিঠির সঙ্গে বন্ধুর আশ্রয়ে নিয়ে এসেছ! সমস্ত পায়রার জাত আর ভারতীয় সেনাদলের গৌরব তুমি বাড়িয়েছ—তোমার ডানায় স্বর্গের সৌন্দর্য দেখতে পাচ্ছি! আবার সে আমার পায়ে চুমু দিলে। তার বিনয়ে আমি গলে গেলুম, তার দৃষ্টান্তে আমি তুচ্ছ হয়ে গেলুম—যখন মনে পড়লো, এয়ারোপ্লেন্ আমার ডানার খানিকটা ভেঙে দিলে কি রকম করে' আমি ভারতীয় সেনাদলের ট্রেঞ্চের মধ্যে পড়ি; আর যদি জার্মান ট্রেঞ্চের মধ্যে পড়তুম তবে⋯তারা আমার পা থেকে চিঠি খুলে নিত, ঘণ্ডালু

যেখানে সেই বুনো কুকুরটার সঙ্গে লুকিয়ে বসে ছিল সেই বন তারা ঘিরে ফেলতো—তারা যে কি করতো ভাবতে কেঁপে উঠলুম! হায়! সেই কুকুর আমাদের যথার্থ বন্ধু ও মুক্তিদাতা, সে এখন কোথায়?



আট

"ঘণ্ডাসু গল্পটা আরম্ভ করলে—"যুদ্ধের গোড়ায় সেই কুকুরটা তার ফরাসী প্রভুকে নিশ্চয় হারিয়েছিল। সম্ভবত জার্মানেরা লোকটাকে গুলি করে মারে; তারপর যখন সে দেখলে তার প্রভুর বাড়ী লুট হল আর তার গোলাঘরে আগুন লাগানো হল, তখন সে ভয়ে দিশাহারা হয়ে বনের মধ্যে ছুটে পালালো। সেখানে সে মানুষের চোখের অন্তরালে ঘন কাঁটাঝোপের তলায় লুকিয়ে রইলো—সে জায়গাটা কুঁড়েঘরের চেয়ে চওড়া নয় আর কবরের ভিতরের মত অন্ধকার। সম্ভবত সে আহারের সন্ধানে কেবল রাতেই সাহস করে বার হ'ত; আর শিকারী কুকুরের বংশে যার জন্ম, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বনে বনে আইনের আশ্রয়চ্যুত চোর ডাকাতের মত ঘুরে ঘুরে তার সমস্ত হিংস্র প্রবৃত্তি ফিরে এল।

"আমার সঙ্গে দেখা হলে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল আমি ভয় পাইনি দেখে। আমার গায়ে ভয়ের গন্ধ ছিল না। অনেক মাসের মধ্যে নিশ্চয়ই আমিই প্রথম মানুষ যার ভয়ে ভড়কে গিয়ে সে আক্রমণ করলে না।

"অবশ্য সে ভেবেছিল, আমিও তারি মত ক্ষুধার্ত, আমিও খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছি। তাই সে আমাকে জার্মানদের রসদঘরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল, সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে গুড়ি মেরে সে একটা প্রকাণ্ড ভাঁড়ারঘরে উপস্থিত হল—খাবারের সোনার খনি বললেই চলে—আমার জন্যে কিছু মাংস সংগ্রহ করে আনলে। তা থেকে অনুমান

করলুম যে মাটির তলায় সারি সারি চোরা কুঠরি আছে, আর সেখানে কেবল খাবার নাই, পেট্রল আর বিস্ফোরকও আছে। সেই অনুমানের উপর নির্ভর করে আমি যথাকর্তব্য করলুম। আমার অনুমান ভুল হয়নি। যাক এখন অন্য কথা বলি।

"সত্য বলতে কি, যুদ্ধের আলোচনা মোটেই ভালো লাগে না। দেখ, হিমালয়ের শিখরে শিখরে কেমন সূর্যাস্তের আলো পড়েছে, এভারেষ্ট-শৃঙ্গ সোনার মুকুট পরেছে!"

ঘণ্ডালু আস্তে আস্তে আমাদের বাড়ী থেকে বার হয়ে গেল। কলিকাতা থেকে সে যাত্রা করবে সিঙ্গালেলের কাছে লামাসারির উদ্দেশে, কিন্তু সেখানকার কথা বলার আগে, তোমাদের বলা উচিত সে ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাদের বাড়িতে কি করে এল।

১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ নাগাদ ভারতীয় সেনাদল বেশ বুঝতে পারলে যে চিত্রগ্রীব আর উড়বে না। যে তাকে এনেছিল, সেই ঘণ্ডালু সৈনিক নয়। একটা বাঘ কি চিতা ছাড়া আর কিছু সে জীবনে মারেনি, তা ছাড়া এখন সে-ও পীড়িত, তাই তাদের দু'জনকেই ভারতবর্ষে ফেরত পাঠানো হল। মার্চ মাসে তারা কলিকাতা এসে পৌছলো। তাদের দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। ঘণ্ডালুর চেহারা চিত্রগ্রীবের মতই ভীত, সন্ত্রস্ত—দু'জনই খুব পীড়িত মনে হল।

আমার পায়রাটিকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে হিমালয় যাত্রা করার আগে ঘণ্ডালু ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বল্লে—"আমার মন থেকে ঘৃণা ও ভয় সরানো দরকার। মানুষের হাতে মানুষের

হত্যা অনেক দেখেছি। আমাকে বাড়ি ফেরত পাঠিয়েছে, তার কারণ আমায় এক বিষম রোগে ধরেছে—সে-রোগের নাম ভয়। এই রোগ সারাবার জন্যে একলা আমাকে প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যেতে হবে।"

তাই সে সিঙ্গালেল লামাসারিতে গেল ধ্যানধারণার দ্বারা রোগমুক্ত হবার জন্য। সেই অবসরে চিত্রগ্রীবকে সারাবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলুম। তার স্ত্রী ও বড়ো বড়ো ছেলেমেয়েরা তার কোনো কাজেই লাগলো না। তারা তাকে অচেনা পাখী বলে ধরে নিলে, কারণ চিত্রগ্রীব তাদের প্রতি স্নেহ বা আদরের ভাব দেখালে না। স্ত্রীকে অবশ্য তার খুব ভালোই লাগলো, কিন্তু সেও তাকে ওড়াতে পারলে না। বড় জোড় একটু লাফায়, তা ছাড়া সে কিছুই করতে চায় না—কোনো উপায়েই তাকে আকাশে ওড়ানো সম্ভব নয়। ভালো পায়রার ডাক্তারকে তার ডানা আর পা দেখালুম, তারা বল্লে সব ঠিক আছে। তার ডানা বা হাড়ে কোনো দোষ নাই, তবুও সে উড়বে না। ডানদিকের ডানা সে খুলতেই রাজি নয়; দৌড়নো বা লাফানোর সময় ছাড়া সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যাস করলে।

তাতে কিছু ক্ষতি ছিল না, যদি না সে আর তার স্ত্রী ঠিক সেই সময়ে বাসা বাঁধতে সুরু করতো। বৈশাখ মাসে গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হলে আমি ঘণ্ডালুর চিঠি পেলুম। সে লিখলে—তোমার চিত্রগ্রীবের এখন বাসা বাঁধা উচিত নয়। যদি ডিম থাকে তবে সেগুলো নষ্ট করে দিয়ো। দেখো, কোন রকমেই যেন ওরা

ডিম ফোটাতে না পারে। চিত্রগ্রীবের মত অসুস্থ বাপ—ভয়-রোগে যাকে ধরেছে—জগতে রোগা-পট্‌কা অসুস্থ বাচ্চাই আনতে পারে। তাকে এখানে নিয়ে এস। চিঠি শেষ করার আগে বলা দরকার যে আমি ভালো বোধ করছি। শীগ্‌গির চিত্রগ্রীবকে নিয়ে এস—সাধু লামা তাকে আর তোমাকে দেখতে চান। তা ছাড়া সুইফ্‌ট্‌ পাখীরা পাঁচজনই এ সপ্তাহে দক্ষিণ থেকে এসে পৌঁছেচে—তোমার পোষা পাখীটাকে তারা ভুলিয়ে রাখবে।

ঘণ্ডালুর পরামর্শ নিলুম। চিত্রগ্রীবকে এক খাঁচায় আর তার স্ত্রীকে অন্য এক খাঁচায় পুরে উত্তরে যাত্রা করলুম।

সেবারের শরতের পাহাড় আর এই বসন্তের পাহাড়ে কত তফাৎ! আমার বাপ-মা এবার কয়েকদিন আগে থেকেই দেন্‌তামের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিলেন। বৈশাখের শেষের দিকে সেখানে পৌঁছে চিত্রগ্রীবকে সঙ্গে নিয়ে এক তিব্বতী পথিকদলের সঙ্গে টাট্টু ঘোড়ায় চেপে রওনা হলুম। চিত্রগ্রীবের স্ত্রীকে রেখে গেলুম—চিত্রগ্রীব আবার উড়তে পারলে তার কাছে ফিরে আসবে—তাকে সারাবার স্ত্রীই হল ওষুধ, সে-ই চিত্রগ্রীবকে টানবে। ঘণ্ডালু আশা করেছিল নতুন-পাড়া ডিমগুলো ফোটাবার কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করবার জন্য চিত্রগ্রীব হয়ত উড়ে ফিরতে পারে। আমাদের যাত্রার পরদিনই বাবা-মা সে ডিমগুলো নষ্ট করে ফেলেছিল, কারণ আমরা রুগ্ন অপদার্থ বাচ্চা চাই না—যারা বড় হয়ে চিত্রগ্রীবের নাম ডোবাবে।

পাখীটাকে কাঁধে করে নিয়ে রওনা হলুম—সেখানে সে

সারাদিন বসে রইলো। রাতে তাকে খাঁচার মধ্যে নিরাপদে বন্ধ করে রাখতুম। এতে তার উপকার হল। বারো ঘণ্টা ধরে পাহাড়ের আলো বাতাস লেগে তার শরীরের উন্নতি হল, কিন্তু তবুও সে স্ত্রীর কাছে ফিরে তাকে ডিম-ফোটানোয় সাহায্য করবার জন্য একবারও আমার কাঁধ থেকে উড়ে যাবার চেষ্টা করলে না।

বসন্তের হিমালয় অপূর্ব। সাদা ভায়োলেট ফুলে মাটি ঝিকমিক করছে, তার মাঝে মাঝে রাস্‌পবেরি পাকতে সুরু করেছে। তপ্ত স্যাঁতা গুহার মধ্যে 'ফার্ণ' লম্বা হাত বাড়িয়ে সাদা পাহাড়গুলোকে যেন জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে। আর সেই পাহাড়গুলো যেন আকাশের গাঢ় নীল কণ্ঠের উপর বসানো জড়োয়া পাথর! মাঝে মাঝে ঘন বন সেখানে বেঁটেখাটো 'ওক', অতিকায় 'এল্‌ম্', দেওদার আর বাদাম গাছের এমন ছড়াছড়ি যে তাদের ডালপালা ভেদ করে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে না। গাছে গাছে, ডালে ডালে, শিকড়ে শিকড়ে আলো আর জীবনের জন্য লড়াই চলেছে। তাদের নীচে ছায়ান্ধকারে হরিণের দল লম্বা ঘাস আর কচি ডালপালা চরে চরে খাচ্ছে—এরাই আবার একদিন বাঘ, চিতা আর পান্থারের খাদ্যে পরিণত হবে। চারিদিকেই প্রাণের প্রাচুর্য পশুপাখী গাছপালার মধ্যে টিকে থাকার সংগ্রামকে আরো উগ্র করে তুলছে। প্রাণধারণের প্রকৃতি এমনি আত্মবিরোধী—কীটপতঙ্গও এ থেকে মুক্ত নয়।

বনের অন্ধকার থেকে বার হয়ে ফাঁকা জায়গায় পৌছে ঝাঁঝালো রোদে চোখে ধাঁধা লাগলো। কত সোনালি পোকা বাতাসে

কাঁপছে, আর প্রজাপতি, চড়ুই, তোতা, পাপিয়া ও ময়ুর গাছে গাছে চুড়ায় চুড়ায় পরস্পরে সোহাগ জানাচ্ছে বা কলরব করছে।

পথের এক পাশে চায়ের বাগান, ডান দিকে দেবদারু বন। মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে আমরা প্রায় ছুরির মত খাড়া চড়াইয়ে ওঠবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি। সেখানে বাতাস এত হাল্কা যে নিশ্বাস নেওয়া কষ্টকর। শব্দ আর তার প্রতিধ্বনি বহুদূর পৌঁছায়, ফিসফিস করে কথা বল্লেও কয়েক হাত তফাৎ থেকে শোনা যায়। মানুষ ও পশু নির্বাক হয়ে গেল, কেবল টাট্টুর ক্ষুরের শব্দ কানে আসছে। চারিদিক নিঃসাড় নির্জন—তারই ভারে সকলে যেন নেতিয়ে পড়লো। ঘন নীল আকাশের গহ্বরে মেঘের চিহ্ন নাই, নড়াচড়ার কোনো শব্দ নাই, কেবল উত্তরমুখো বকের ঝাঁকের দীর্ঘনিশ্বাসের মত ডানার শব্দ বা কাছাকাছি কোনো নাবাল জায়গায় ঈগলের ঝাঁপ দেওয়ার গম্ভীর শব্দ। সবই শীতল তীক্ষ্ণ আর জীবন্ত। রাতারাতি 'অর্কিড্' ফুটে উঠে আমাদের দিকে তার বেগুনেরঙের চোখ মেলে চাইলে, গাঁদা ফুলের উপর সকালের শিশির ঝলমল করছে, নীচেকার হ্রদে শ্বেত ও নীল পদ্ম মৌমাছিদের সামনে পাপড়ি মেলে ধরেছে।

এইবার সিঙ্গালেলের কাছে এসে পৌঁছেচি। লামাসারি থেকে উঁচিয়ে পাহাড়ের ধার থেকে আমাদের ডাকছে। তার ডানার মত ছাত আর অতি প্রাচীন দেওয়ালগুলো আকাশের গায়ে পতাকার মত উড়ছে। উৎসাহে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে সুরু করলুম, আর একঘণ্টা পরে মঠের খাড়া পথে এসে পৌঁছলুম।

প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রামের উপরে যারা বাস করে তাদের মাঝে থাকায় কি আরাম! তখন দুপুর, তাই আমি ঘণ্ডালুর সঙ্গে সুগন্ধি বনের মাঝ দিয়ে ঝর্ণার ধারে নেমে গেলুম। সেখানে স্নান করে চিত্রগ্রীবকেও বেশ করে স্নান করিয়ে দিলুম। খাঁচার মধ্যে তার আহার শেষ হলে ঘণ্ডালু আর আমি খাওয়ার ঘরে গেলুম, লামারা সেখানে আমাদের জন্য বসে ছিলেন। ঘরটা দেখতে যেন আবলুশ কাঠের থামের শ্রেণী—থামেব মাথায় সোণার 'ড্র্যাগন্'এর সজ্জা। সেগুনকাঠের কড়িগুলো বহু শতাব্দী পেরিয়ে আসতে আসতে কালো হয়ে উঠেছে—তাতে পরিষ্কার চওড়া পদ্মের নক্‌সা—সেগুলি জুঁই ফুলের মত কোমল কিন্তু ধাতুর মত জোরালো। লাল বালি-পাথরের মেঝে, তার উপর কমলারঙের আলখেল্লা-পরা সন্ন্যাসীরা নীরবে বসে ভগবানকে ডাকছে। প্রতিবার খাওয়ার আগে তারা ভগবানকে স্মরণ করে। ঘণ্ডালু আর আমি খাওয়ার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রার্থনার শেষে তারা একত্রে সুর করে যা বল্লে তার মানে—

সকল জ্ঞানের আধার যে বুদ্ধ তিনিই
আমাদের শরণ—
ধর্ম'ই আমাদের শরণ—
জীবনপদ্মে যে-সত্য
মণির মত উজ্জ্বল—
সেই সত্যই আমাদের শরণ

অতঃপর এগিয়ে গিয়ে মঠের অধ্যক্ষকে নমস্কার করলুম।

আমাকে আশীর্বাদ করবার সময় তাঁর গম্ভীর মুখ হাসিতে ভরে গেল। অন্যান্য লামাদের নমস্কার করে ঘণ্ডালু ও আমি খেতে বসলুম। মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছি, আমাদের সামনের ছোট ছোট কাঠের টুলগুলি বুক পর্যন্ত পৌছেচে। গরমে হেঁটে আসার পর ঠাণ্ডা মেঝেয় বসে ভারি আরাম বোধ হল। বরবটির ঝোল, আলুভাজা আর বেগুনের তরকারি আমাদের খেতে দিয়েছে। ডিমও দিয়েছিল, কিন্তু ঘণ্ডালু আর আমি নিরামিষ খাই, তাই সেটা বাদ দিলুম। এই ত গেল খাদ্য, পানীয় হল গরম সবুজ চা।

খাওয়ার পর অধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে বিশ্রামের জন্য ডাকলেন। তাঁর সঙ্গে সব চেয়ে উঁচু চূড়ার উপর উঠলুম—সেখানটা ঈগলের বাসার মত। চূড়ার উপর 'ফার' গাছের কুঞ্জ, তার মধ্যে একটি রুক্ষ শূন্য কুঠরি, তাতে আসবাবপত্রের নামগন্ধও নাই। এর আগে এ কুঠরি দেখিনি। সেখানে বসবার পর সাধু বলতে লাগলেন—এই মঠে আমরা 'অনন্ত করুণা'র কাছে দিনে দুবার করে প্রার্থনা করেছি, জগতের মানুষের রোগমুক্তির জন্যে। তবুও যুদ্ধ চলেছে, আর সে-যুদ্ধ পশুপাখীর মনেও ভয় ও ঘৃণার বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। দেহের রোগের চেয়ে মনের রোগ তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। হিংসা দ্বেষ ভয় ও সন্দেহের ভারে মানুষ এমন পীড়িত হবে যে এক যুগের আগে আর তা থেকে মুক্তি পাবে না।

লামার মসৃণ ললাট অসীম দুঃখে কুঞ্চিত হয়ে উঠলো; ঠোঁটের কোণদুটো শ্রান্তিভারে নেতিয়ে পড়লো। যুদ্ধ থেকে অনেক

তফাতে তাঁর সেই ঈগলের বাসায় থাকলেও, মানুষের পাপের ভার তিনি তাদের চেয়েও বেশি বোধ করেন, যারা জগতকে যুদ্ধের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে।

ঈষৎ হেসে তিনি আবার সুরু করলেন—এস এবার ঘণ্ডালু আর চিত্রগ্রীবের কথা আলোচনা করা যাক! তোমার পায়রাকে আবার আকাশের শান্তির মধ্যে ওড়াবার ইচ্ছা থাকলে, অসীম সাহসের ধ্যান করতে হবে—এতদিন ধরে ঘণ্ডালু নিজের জন্যে যেমন করে আসছে!

কেমন করে প্রভু!—আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম। মঠের অধ্যক্ষের হল্‌দে মুখ রঙে ভরে উঠলো। নিশ্চয়ই আমার সোজা প্রশ্নে তিনি কুণ্ঠা বোধ করছেন দেখে আমার লজ্জা হল। তড়বড় করার মত সরাসর ভাবটাও খুব অভব্যতা।

যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন, লামা আমার কুণ্ঠা দূর করবার জন্য বল্লেন—প্রতিদিন ভোরবেলা আর সন্ধ্যায় চিত্রগ্রীবকে কাঁধের ওপর বসিয়ে আপনাকে বলবে, 'সমগ্র জীবনের মধ্যে অসীম সাহস আছে! প্রত্যেক প্রাণী যারা নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে, যারা জীবন-ধারণ করছে, সকলেই অসীম সাহসের আধার! যেন এমন নির্মল হতে পারি যাতে করে যাদের ছোঁব তাদের মধ্যে অসীম সাহসের সঞ্চার হবে!' কিছুকাল এমনি করতে থাকলে একদিন তোমার হৃদয় মন আত্মা একেবারে নির্মল হয়ে উঠবে। সেই মুহূর্তে তোমার আত্মার শক্তি—যে আত্মা ভয় থেকে হিংসা থেকে সন্দেহ থেকে মুক্ত হয়েছে—পায়রার মধ্যে ঢুকে

তাকে মুক্তি দেবে! যা বলছি, দিনে দুবার তাই করতে থাকো। আমাদের লামারা তোমাকে সাহায্য করবে। দেখাই যাক না এ থেকে কী হয়!

একটুখানি চুপ করে থেকে লামা বলতে লাগলেন, "ঘণ্ডালু অন্য সব মানুষের চেয়ে জন্তুদের বেশি বোঝে। সে তোমাকে বলেছে যে আমাদের ভয় জন্তুদের ভয় পাওয়ায়, তার ফলে তারা আমাদের আক্রমণ করে। তোমার পায়রা এমন ভয় পেয়েছে যে, সে ভাবে সমস্ত আকাশটাই তাকে আক্রমণ করতে আসছে। গাছের পাতা ঝরলে সে চমকে ওঠে। ছায়া দেখলে তার প্রাণে আতঙ্ক হয়। অথচ সে নিজেই তার দুঃখের হেতু।

"ঠিক এই সময়ে আমাদের নীচে যে গ্রাম—ওই যে ওখানে উত্তর-পশ্চিমে দেখতে পাচ্ছ—ওখানেও ওদের চিত্রগ্রীবের মতই ব্যারাম। এই সময়ে জীবজন্তু উত্তরে আসে বলে বাসিন্দারা ভয় পেয়ে যত সব মর্চে-ধরা বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বুনো জন্তু মারবার জন্যে; আর তার ফলে ছাখো জন্তুরা এখন তাদের আক্রমণ করছে, যদিও তারা আগে কখনো এমন করতো না! বাইসন এসে তাদের শস্য খেয়ে যায়, চিতাবাঘ তাদের ছাগল চুরি করে। আজ এখানে খবর এসেছে, কাল রাতে বুনো মোষে একটা মানুষ মেরেছে। আমি তাদের বলি ধ্যান ধারণা করে মন থেকে ভয় তাড়াও, কিন্তু তারা তা কিছুতেই করবে না!"

ঘণ্ডালু জিজ্ঞাসা করলে—এই সব জন্তুদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করার অনুমতি কেন আমায় দেন না?

লামা উত্তর দিলেন—এখনো সময় আসেনি। তুমি যখন জেগে থাক তখন তোমার মনে ভয় থাকে না বটে, কিন্তু তোমার স্বপ্নে এখনো ভয়ের বাসা রয়েছে। আর দিনকত আমাদের ধ্যান করতে হবে, তখন তোমার মনে এ রকম কোনো ময়লা আর থাকবে না। তুমি সেরে যাবার পরও যদি গ্রামে জানোয়ারের উপদ্রব চলে, তখন তুমি গিয়ে তাদের সাহায্য করতে পারো।



নয়

দিন দশেক পরে, চিত্রগ্রীবকে নিয়ে লামার সঙ্গে দেখা করবার ডাকে এল। পায়রাটিকে দু'হাতের মধ্যে ধরে পাহাড় বেয়ে আবার তাঁর সেই কুঠুরিতে গিয়ে হাজির হলুম। লামার মুখ সাধারণত হলুদবর্ণ, আজ তা বাদামী দেখাচ্ছে, তাতে শক্তির ছাপ খুব স্পষ্ট। তাঁর বাদামের-আকার চোখে একটি অপূর্ব শক্তি ও স্থিরতা যেন জলজ্বল করছে। তিনি চিত্রগ্রীবকে হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন—

ভয় তোমার কাছ থেকে পালাচ্ছে
হিংসা তোমার কাছ থেকে পালাচ্ছে
সন্দেহ তোমার কাছ থেকে পালাচ্ছে!
তুমি সুস্থ হলে
তুমি সুস্থ হলে
তুমি সুস্থ হলে!
—শান্তি, শান্তি, শান্তি!

ক্রমে সূর্য অস্ত গেল হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় রংমশাল জ্বালিয়ে দিয়ে। উপত্যকা গুহা বন বেগুনী চাদর জড়িয়ে বসলো।

আস্তে আস্তে চিত্রগ্রীব লামার হাত থেকে লাফিয়ে নামলো, কুঠরির দোরের কাছে হেঁটে গেল, তারপর সূর্যাস্তের পানে চেয়ে রইলো। তারপর নিঃশব্দে সে তার ডান পাখাখানি খুলে— পালকের পর পালক, পেশীর পর পেশী, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত সেটি নৌকার পালের মত ছড়িয়ে পড়লো। তখনি হুস করে

উড়ে যাওয়ার মত কোনো নাটুকে ব্যাপার না করে, সে সাবধানে ডানাদুটি মুড়ে ফেল্লে—যেন তা দুখানি দামী অথচ পল্‌কা পাখা। পুরোহিতের মত ভারিক্কি চালে সে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল, কিন্তু চোখের আড়াল হতে না হতেই শুনতে পেলুম বা মনে হল যেন শুনতে পেলুম ডানার ঝটপট শব্দ। তাড়াতাড়ি উঠে কি হল দেখতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু সাধু আমার কাঁধের উপর হাত রেখে নিবারণ করলেন—তাঁর ঠোঁটে একটুখানি হাসি—তার মানে বোঝা ভার।

পরদিন সকালে চিত্রগ্রীবকে খেতে দিতে গিয়ে দেখি খাঁচার দোর খোলা, পায়রার নাম গন্ধও নাই। আমি অবাক হলুম না, কারণ লামাসারিতে থাকবার সময় রাতে খাঁচার দরজার খিল দিতুম না। কিন্তু সে গেল কোথা? প্রধান মঠে তাকে না পেয়ে আমরা লাইব্রেরীতে গেলুম। সেখানে বাইরের দিকের একটা খালি কুঠরিতে আমরা তার কতকগুলো পালক দেখতে পেলুম, আর কাছেই ঘণ্ডালু ভামের পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলে। বিপদের ভয় হল। কিন্তু যদি ভাম তাকে আক্রমণ করে মেরেই থাকে, তাহলে মেঝেতে রক্তের দাগ থাকতো। তাহলে সে পালালো কোন্ দিকে? সে করলে কি? এখন সে কোথা? ঘণ্টাখানেক আমরা ঘুরে বেড়ালুম। ঠিক যখন খোঁজাখুঁজি বন্ধ করবো বলে স্থির করেছি, অমনি শুনতে পেলুম সে কুম্-কুম্ করে ডাকছে। লাইব্রেরীর ছাতের উপর বসে সে তার পুরনো বন্ধু-সুইফট্‌দের সঙ্গে কথা কইছে—তারা কার্ণিসের তলায় তাদের

বাসা আঁকড়ে ছিল। তার কুম্-কুমের উত্তরে তারা যা বলেছে তা বেশ শুন্‌তে পেলুম। কর্তা-সুইফ্‌ট বল্লে, "চীপ চীপ চীপ"! খুসি হয়ে চিত্রগ্রীবকে সকালের খাওয়ার ডাক দিলুম—আয় আয়! সে গলা বেঁকিয়ে শুনতে লাগলো। তারপর আবার যেই ডেকেছি সে আমাকে দেখতে পেলে, আর তখনি সশব্দে ডানা ফট্‌ফট্ করে উঠলো, তারপর উড়ে নেমে এসে আমার কব্জির উপর বসলো।

সেদিন লামাসারিতে এক ভয়ানক খবর এসে পৌঁছলো। লামা যে-গ্রামের কথা আগের দিন বলেছিলেন, সে-গ্রামে এক বুনো মোষ দেখা দিয়েছে। আগের দিন সন্ধ্যাবেলা সেখানে হাজির হয়ে সে তুজন লোক মেরেছে! বারোয়ারী খামারের চারিদিকে গাঁয়ের মোড়লদের এক সভা বসেছিল। সভা ভাঙবার পর লোক তুটি বাড়ী ফিরছিল। গাঁয়ের লোকেরা মঠের অধ্যক্ষের কাছে লোক পাঠিয়েছিল, পশুটা যাতে ধ্বংস হয় তার জন্য পূজা দেবার জন্ম, আর তার ঘাড়ের ভূত ঝাড়বার জন্ম। সাধু বল্লেন, খুনে মোষটা যাতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মারা পড়ে, তিনি তার উপায় করবেন। ঘণ্ডালু সেখানে উপস্থিত ছিল, সে জিজ্ঞাসা করলে—জানোয়ারটা কতদিন থেকে গাঁয়ে উৎপাৎ করছে? সকলে সমস্বরে বলে উঠলো, এক সপ্তাহ থেকে সে রোজ রাতে আসছে! তাদের ফসলের প্রায় আধাআধি সে খেয়ে সাবাড় করেছে!

গ্রামবাসীরা বিদায় হলে লামা ঘণ্ডালুকে বল্লেন, এখন তুমি সুস্থ হয়েছ, এবার খুনেটাকে মারো গিয়ে!

"কিন্তু প্রভু!"

"আর ভয় নেই ঘণ্ডালু? তোমার ধ্যানই তোমার রোগ সারিয়েছে। ধ্যানের দ্বারা এখানে তুমি যা পেয়েছ বনে গিয়ে তার পরখ্ করো। নির্জনতার মাঝে মানুষ শক্তি আর স্থিরতা সঞ্চয় করে তার পরখ্ করতে হয় ভিড়ের মাঝে গিয়া। এখন থেকে সূর্য ডুবার অস্ত যাবার আগেই তুমি জয়ী হয়ে ফিরে আসবে। তোমার শক্তিতে আমার বিশ্বাস কত তার প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে এই ছেলেটি ও পায়রাটিকে সঙ্গে নিতে বলছি। যাও খুনেটাকে শাস্তি দাও?"

সেদিন বিকালবেলা জঙ্গলে রওনা হলুম। অন্তত একরাত জঙ্গলে কাটাতে পারবো তাই ভেবে আমি খুসি হয়ে উঠলুম। ঘণ্ডালু আর পায়রা দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠেছে; তাদের সঙ্গে জঙ্গলে বুনো মোষের সন্ধানে যাওয়ায় কি আনন্দ! এ সুযোগ চায় না, জগতে এমন ছেলে কি আছে?

দড়ির মই, ফাঁস আর ছুরিছোরা সংগ্রহ করে চিত্রগ্রীবকে কাঁধে নিয়ে রওনা হলুম। বিকাল তিনটা নাগাদ লামাসারির উত্তর পশ্চিমের গ্রামে পৌছলুম, সেখান থেকে মোষের পায়ের চিহ্ন দেখে দেখে ঘন ঘন আর বিস্তীর্ণ ফাঁকা জমি পার হয়ে চল্লুম। মাঝে মাঝে স্রোতস্বতী পার হচ্ছি, কখনো আবার প্রকাণ্ড পোড়ো গাছের উপর চড়তে হচ্ছে। মোষের পায়ের চিহ্ন কি গভীর আর পরিষ্কার!

ঘণ্ডালু বল্লে—নিশ্চয়ই জন্তুটা ভীষণ ভয় পেয়েছে, দেখছো না কত জোরে এখানটা মাড়িয়েছে! সাধারণ অবস্থায় জন্তু পিছনে

অতি সামান্য চিহ্নই রেখে যায়, কিন্তু ভয় পেলে তারা এমন করে যেন প্রাণ হারাবার ভয় তাদের দেহের উপর ভারের মত চেপে ধরেছে। মোষটার ক্ষুর যেখানেই পড়েছে সেখানেই গভীর স্পষ্ট চিহ্ন এঁকে দিয়েছে। বেজায় ভয় পেয়েছিল নিশ্চয়!

অবশেষে আমরা এক নদীর ধারে পৌঁছুলুম—সেটা পার হওয়া অসম্ভব। ঘণ্ডালুর মতে এমনি তার স্রোতের জোর যে তার মধ্যে নামলে পা ভেঙে যাবে। আশ্চর্যের কথা, মোষটাও সে নদী পার হতে সাহস পায়নি। আমরা তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলুম—নদীতীরে তার ক্ষুরের চিহ্নের সন্ধান করতে লাগলুম। মিনিট কুড়ির মধ্যেই দেখতে পেলুম তার পায়ের চিহ্ন নদীর ধার থেকে সরে গিয়ে ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। বেলা তখনো পাঁচটা বাজেনি, কিন্তু তারি মধ্যে সে জঙ্গল পাতালপুরীর মত অন্ধকার দেখাচ্ছে। গ্রাম থেকে এ জায়গায় দৌড়ে আসতে যে কোনো বয়সের বুনো মোষের আধঘণ্টার বেশি সময় লাগতে পারে না।

ঘণ্ডালু জিজ্ঞাসা করলে—জলের গান শুনতে পাচ্ছ? কয়েক মিনিট শোনবার পর জলের কল্‌কল্ শব্দ কানে এল—উলুঘাস ঝোপঝাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে জল ছুটে চলেছে। একটা হ্রদের মধ্যে সেই নদী গিয়ে পড়ছে—সে-হ্রদ আমাদের কাছ থেকে হাত বারো চোদ্দর মধ্যেই। ঘণ্ডালু বল্লে, সেই খুনে মোষটা এই কাছ বরাবর কোথাও লুকিয়ে আছে, হয়ত ঘুমিয়ে রয়েছে। এই যে জোড়া-গাছ দেখা যাচ্ছে ওরই একটাতে চলো গিয়ে বসি। অন্ধকার হয়ে আসছে, সে এখানে এল বলে। সে যখন আসবে তখন মাটির ওপর থাকা

চলবে না। ওই দুটো গাছের মধ্যে বড় জোর হাত দুই জায়গা রয়েছে।

তার শেষ কথাগুলো অদ্ভুত ঠেকলো। তাই গাছদুটোর মাঝের জায়গাটা লক্ষ্য করে দেখলুম। লম্বা মোটা মোটা গাছ, মাঝে একটুকরো জমি, সেখান দিয়ে আমরা দুজনে পিছু পিছু হাঁটতে পারি, পাশাপাশি নয়।

যমজ গাছদুটোর মাঝামাঝি এবার আমার ভয়ে-ভেজা জামা রেখে দিই!

তারপর ঘণ্ডালু তার জামার তলা থেকে এক বাণ্ডিল পুরনো কাপড়-চোপড় বার করতে সুরু করলে। সেগুলো সেদিন পর্যন্ত তার গায়ে ছিল। মাটির ওপর বাণ্ডিলটি রেখে দুটো গাছের একটায় সে উঠলো, ওপরে উঠে আমার জন্য একটা দড়ির মই ফেলে দিলে। আমি সেটা দিয়ে উঠতে লাগলুম! চিত্রগ্রীব তখন আমার কাঁধের উপর ডানা ফটফট করছে টাল সামলাবার চেষ্টায়, ঘণ্ডালু যে ডালটার উপর বসেছিল দুজনেই নিরাপদে সেখানে গিয়ে পৌঁছলুম। সন্ধ্যার আর দেরী নাই, কিছুক্ষণ আমরা স্থির হয়ে বসে রইলুম।

তখন প্রথম লক্ষ্য করলুম পাখীদের। রকমারি পাখীতে বন যেন ভরে উঠলো—ছোট বড় মাঝারি—তাদের কত রকম সুর কত রকম রং। তারপর কানে আসতে লাগলো নানারকম শব্দ। মৌমাছির গুন্ গুন্, কাঠঠোকরার ঠক-ঠক, অনেক উঁচুতে ঈগলের তীক্ষ্ণ ডাক—এ সব শব্দের সঙ্গে মিশে গেল পাহাড়িয়া জলধারার হুহু শব্দ আর হায়েনার হাড়খাই হাসি—দিবানিদ্রার শেষে তারা জাগতে সুরু করেছে।

যে-গাছে আমাদের রাতের বাসা, সেটি খুব লম্বা। আমাদের উপরে চিতা বা সাপ বসে নাই, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্ম আমরা আরো উপরে উঠলুম। ভালো করে দেখেশুনে দুটো ডাল বেছে নিলুম। তার মাঝে দড়ির মইটাকে ঝুলিয়ে দিলুম শক্ত হ্যামক-এর মতন। ঠিক যেই বাগিয়ে বসেছি অমনি ঘণ্ডালু আকাশের দিকে দেখালে। উপরপানে চেয়ে দেখি মস্ত বড় এক ঈগল চুণির পাখায় ভর দিয়ে শূন্যে ভাসছে। জঙ্গলের তলা থেকে অন্ধকার জোয়ারের জলের মত উঠলেও মাথার উপরে শূন্যে আকাশ ঝিকমিক করছে পায়রার গলার মত, আর তার মাঝ দিয়ে সেই একটি ঈগল বারবার চক্রাকারে ঘুরছে। সে প্রাকার দরুণ পতঙ্গ ও পাখী ইতিপূর্বেই নীরব হয়েছে। সে আছে তাদের অনেক উঁচুতে, তবুও তারা নির্বাক ভক্তের মত স্তব্ধ হয়ে রইলো। তাদের রাজা ঈগলের কী ফূর্তি! ইতস্তত উড়ে বেড়াতে বেড়াতে দরবেশের মত মহানন্দে আলোর উৎস সূর্যের সামনে ডিগবাজি খেতে লাগলো। ক্রমে আস্তে আস্তে তার ডানা থেকে চুণির আলো মিলিয়ে গেল। ডানাদুটো তখন হল সোনার ফুলকির পাড়-বসানো বেগুনী পালের মত। অবশেষে তার পূজা যেন সাঙ্গ হল, সে আরো উপরে উঠলো, তারপর দেবতার সামনে নিজেকে আহুতি দেবার মত করে জলন্ত গিরিচূড়ার পানে উড়ে গেল, তারপর সেই মহিমার মধ্যে অদৃশ্য হল দীপশিখার মাঝে পতঙ্গের মত।

নীচে এক ঘোষের ডাক একে একে পতঙ্গের গলার চাবি খুলে দিলে—সন্ধ্যার স্তব্ধতাকে টুকরো ফালি ফালি করে ছিঁড়ে

ফেল্লে। কাছেই একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো, চিত্রগ্রীব তাই শুনে আমার জামার তলায় আমার বুক ঘেসে বসলো। হঠাৎ হিমালয়ের দোয়েল তার গানের মায়া চারিদিকে ছড়িয়ে দিলে। যেন কোন দেবতা রূপার বাঁশি বাজাতে স্বরু করলেন—সেই স্বরের ধারা বৃষ্টির মত গাছের ডাল বেয়ে নীচে ছুটে চল্লো, এবড়ো-খেবড়ো গাছের ছাল টপকে জঙ্গলের তলায় নামলো, তারপর গাছের শিকড় বেয়ে একেবারে পাতালে প্রবেশ করলে।

সেই মধুর স্বরে ভারি ঘুম পেতে লাগলো। ঘণ্ডালু আর এক গাছা দড়ি দিয়ে বেশ করে আমাকে গাছের সঙ্গে বাঁধলে। তারপর আমি আরামের ঘুমোবার জন্য তার কাঁধে মাথা রাখলুম। কিন্তু তা করবার আগে সে আমাকে তার মতলব বুঝিয়ে বল্লে।

"ওই যে কাপড়-চোপড় ফেলে দিলুম, ওগুলো আমি পরতুম যখন আমার মন ভয়ে ঢাকা ছিল। ওগুলোতে একটা অদ্ভুত গন্ধ আছে। বোকা মোষটা যদি ঐ গন্ধ পায় তবে সে এদিকে আসবে। যে ভয় পেয়েছে সে ভয়ের গন্ধে সাড়া দেয়। আমাদের ফেলা পোষাক যদি সে তদারক করতে আসে তবে আমরা যা পারি তাই করবো। আশা করি আমরা তার গলায় ফাঁস আটকে পোষা বাছুরের মত বাড়ী নিয়ে যেতে পারবো"…তার পরের কথা আমি শুনিনি, কারণ আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম জানি না—একটা ভয়ানক গাঁক্ গাঁক্ শব্দে ঘুম ছুটে গেল। চোখ মেলে দেখি ঘণ্ডালু আমার আগেই জেগেছিল—আমার গায়ে-জড়ানো দড়িটা খুলে দিয়ে নীচুপানে ইসারা

করলে। ভোরের আবছা আলোয় প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলুম না, কিন্তু একটা রাগী জানোয়ারের ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ আর গোঙানি স্পষ্ট শুনতে পেলুম। একদৃষ্টে নীচের দিকে চেয়ে রইলুম। অন্ধকারের ঘোর কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলুম...যা দেখলুম তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। দেখমলু, চকচকে আবলুশের একটা ছোটখাট পাহাড়, আমরা যে-গাছে বসে আছি তার সঙ্গে কালো গা ঘসছে। মনে হল জিনিষটা দশফুট আন্দাজ লম্বা, যদিও তার আধখানা গাছের পাতা আর ডালপালায় ঢাকা ছিল। জন্তুটাকে দেখাচ্ছিল যেন সবুজ চুল্লির ভিতর থেকে একটা কালো পাথর বেরিয়ে আসছে—সকালের রোদে নতুন পাতাগুলোর এমনি জৌলুস।

জামার তলা থেকে চিত্রগ্রীবকে বার করে ছেড়ে দিলুম—সে ইচ্ছামত গাছের উপরে বেড়াক। মইয়ের ধাপের মত গাছের ডালে ডালে পা দিয়ে ঘণ্ডালু আর আমি নামতে লাগলুম। শেষে মোষের হাত দুই উপরে এসে পৌছলুম। সে আমাদের দেখতে পায়নি। ঘণ্ডালু লম্বা ফাঁসের একটা দিক তাড়াতাড়ি গাছের গুড়ির সঙ্গে বেঁধে ফেল্লে। দেখলুম নীচে মোষটা মাঝে মাঝে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরোর মধ্যে শিং ঢুকিয়ে দিয়ে খেলা করছে—ঘণ্ডালুর ফেলে-দেওয়া পোষাকের সেইটুকুই অবশিষ্ট ছিল। নিশ্চয়ই তার মধ্যেকার মানুষের গন্ধ তাকে আকর্ষণ করেছে। তার শিং পরিষ্কার হলেও তার মাথায় টাটকা রক্তের চিহ্ন—মনে হয় সে গ্রামে গিয়ে রাত্রে আর একটা লোককে মেরেছে। তা দেখে ঘণ্ডালুর

উৎসাহ বেড়ে গেল। সে আমার কানে কানে ফিস্‌ফিস্ করে বল্লে—ত্মাখো না, আমরা ওকে জ্যান্তই ধরবো! ওপর থেকে এই ফাঁসটা ওর শিঙের ওপর ফেলে দাও দেখি! চোখের নিমেষে ঘণ্ডালু ডাল থেকে লাফিয়ে মোষটার প্রায় পিছনে পড়লো। জন্তুটা চমকে উঠলো বটে কিন্তু ফিরতে পারলে না; কারণ তার পাশেই ডান দিকে গাছ, সে-কথা আগেই বলেছি; আর তার বাঁ দিকে একটা গাছ যার উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি। বার হতে হলে দুটো গাছের মাঝ দিয়ে হয় তাকে সামনে যেতে হবে, নয় পিছু হটতে হবে; কিন্তু তা' ঘটবার আগেই আমি তার মাথার উপর ফাঁস ফেলে দিয়েছি। দড়িটার স্পর্শ তার উপর ইলেক্‌ট্রিসিটির কাজ করলে। ফাঁসটা খুলে ফেলবার জন্য সে ধাঁ করে পিছু হটে এল, এমন তাড়াতাড়ি যে ঘণ্ডালু পাশের গাছটা ঘুরে চলে না গেলে জন্তুটার ধারালো ক্ষুরের তলায় পড়ে মারা যেত। কিন্তু এখন আমি সভয়ে দেখতে পেলুম, দুটো শিঙের গোড়ায় চেপে ফাঁস বসাতে পারিনি, কেবল একটা শিঙে ফাঁস পড়েছে। ভয়ে আমি চেঁচিয়ে ঘণ্ডালুকে বল্লুম—সাবধান! কেবল একটা শিঙে ফাঁস পড়েছে—যে কোনো মুহূর্তে ফাঁস খুলে যেতে পারে। ছুটে গাছের ওপর উঠে পড়ো এখুনি!

কিন্তু শিকারীর দুর্জয় সাহস—সে আমার পরামর্শে কান দিলে না। শুধু তাই নয়, শত্রুর কিছু দূরে তার মুখোমুখি দাঁড়ালো। দেখতে দেখতে জানোয়ারটা মাথা নামিয়ে সামনে দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভয়ে আমি চোখ বুজিয়ে ফেল্লুম।

আবার যখন চোখ খুল্লুম তখন দেখি, যে-দড়ি তার শিঙে আটকে থাকায় জন্তুটা ঘণ্ডালুর সামনের গাছে ঢুঁ মারতে পারছিল না, সেই দড়িটা সে টানাটানি করছে। তার ভীষণ ডাকে জঙ্গল কেঁপে কেঁপে উঠছে—সে-ডাকের প্রতিধ্বনি একটির পিছু একটি ছুটছে যেন ভয়ার্ত শিশুরা চীৎকার করে পালাচ্ছে।

মোষটা তার কাছে আসতে পারছে না দেখে ঘণ্ডালু তার ছোরা বার করলে। সেটা দেড়ফুট লম্বা, দু'ইঞ্চি চওড়া, আর তার ধার ক্ষুরের মত। সে আস্তে আস্তে ডানদিকে একটা গাছের পিছনে সরে গেল, তারপর তাকে আর দেখতে পেলুম না। সেই যেখানে সে ঘণ্ডালুকে শেষ দেখেছে সেইদিক লক্ষ্য করে জন্তুটা সোজা তেড়ে গেল। ভাগ্যক্রমে দড়িটা তখনো তার শিঙে শক্ত হয়ে আটকে ছিল।

এইবার ঘণ্ডালু তার কায়দা বদলে ফেল্লে। সে উল্টোদিকে ছুটে চলে গেল—গাছের মাঝ দিয়ে ঘোরালো পথে। এরূপ করবার কারণ, সে এমন জায়গায় যেতে চায় যেখান থেকে তার গায়ের গন্ধ বাতাসে ভেসে মোষটার কাছে পৌছবে না। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া সত্ত্বেও জন্তুটা ফিরে তার পিছু নিলে। তখন আবার আমাদের গাছের তলায় ঘণ্ডালুর ছাড়া কাপড়ের বাণ্ডিল তার চোখে পড়লো। অমনি সে খেপে গেল। কাপড়গুলো শুঁকতে শুঁকতে শিং দিয়ে সেগুলো গুঁতুতে সুরু করলে।

ততক্ষণে ঘণ্ডালু বাতাসের সঙ্গ ধরেছে—অর্থাৎ বাতাসের সঙ্গে একপথে চলেছে। তাকে দেখতে না পেলেও আমি অনুমান

করলুম, গাছের আড়ালে মোষটা অদর্শন হলেও গন্ধ শুঁকে সে বলতে পারে সে কোথায় আছে। ঘণ্ডালুর ফেলা-কাপড়ের মধ্যে শিং ঢুকিয়ে দিয়ে জানোয়ারটা আবার গ্যাক্ করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের গাছে বিষম গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল। কোথা থেকে দলে দলে বাঁদর গাছের ডালে ডালে ছুটে এল; কাঠবিড়ালগুলো গেছো ইঁদুরের মত গাছে থেকে ছুটে নামে মাটিতে আবার সেখান থেকে ঝটপট ফিরে আসে গাছে; বক, তোতা প্রভৃতি নানারকম পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে লাগলো—তাদের ডাকাডাকির সঙ্গে মিশে গেল কাক, চিল আর পেঁচার চেঁচামেচি। হঠাৎ মোষটা ছুটে গেল। দেখলুম ঘণ্ডালু স্থির হয়ে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন দৃশ্য আর কখনো দেখিনি। জানোয়ারটার পিছনের পা দুটো কাঁপতে কাঁপতে হুহু করে চলেছে যেন তলোয়ার—তারপর কিছু একটা ঘটলো। সে শূন্যে উঠে গেল—নিশ্চয়ই সেই ফাঁসের দড়ির টানে এমনি হল, তার একটা দিক আমাদের গাছে বাঁধা ছিল। মাটী থেকে কয়েক হাত ওপরে উঠে গিয়ে জানোয়ারটা পড়লো। শুকনো সরু গাছের ডাল শিশুর হাতে যেমন করে ভাঙে তেমনি সহজে তার শিং ভেঙে শূন্যে ছিটকে গেল। শিং-ভাঙার টাল সামলাতে না পেরে সে কাত হয়ে মাটির উপর পড়লো—শূন্যে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একরকম গড়িয়ে গেল বল্লেই চলে। চোখের নিমেষে ঘণ্ডালু সামনে লাফিয়ে পড়লো চকমকি থেকে আগুনের ফুল্‌কির মত। তাকে দেখে মোষটা সামলে নিয়ে পিছনে ভর দিয়ে উঠে বসলো। পায়ে ভর দিয়ে প্রায় দাঁড়িয়ে ওঠার

উপক্রম এমন সময় ঘণ্ডালু তার কাঁধের কাছে খ্যাচ করে ছোরা বসিয়ে দিলে। ছোরার ভীষণ ডগাটা গভীর হয়ে ঢুকলো— ঘণ্ডালু দেহের সমস্ত ভার দিয়ে তার উপর চাপ দিলে। আগ্নেয়-গিরির মুখ যেন ফেটে গেল, এমনি একটা আওয়াজে বন কেঁপে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে রক্তধারা গলানো চুণির ফোয়ারার মত ছিটকে বার হল! সে দৃশ্য আর দেখতে না পেরে আবার চোখ বুঁজলুম।

কয়েক মিনিট পরে গাছ থেকে নেমে দেখি মোষটা মারা গেছে—তার চারিদিকে রক্তের নদী বইছে। কাছেই মাটির উপর বসে ঘণ্ডালু গা থেকে যুদ্ধের দাগ মুছে ফেলেছে। বুঝতে পারলুম সে এখন একলা থাকতে চায়, তাই পুরাণো গাছটায় চড়ে চিত্রগ্রীবকে ডাকতে লাগলুম। সে কোনো জবাব দিলে না। গাছটার আগডালে গিয়ে উঠলুম, কিন্তু বৃথা, সে সেখানে নাই।

যখন নামলুম তখন ঘণ্ডালু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে। সে আকাশের দিকে দেখালে প্রকৃতির মুর্দাফরাস আসছে—নীচে চিল, তাদের অনেক উপরে শকুন। এরই মধ্যে তারা জানতে পেরেছে কে একজন মরেছে—জঙ্গল তাদের সাফ করতে হবে!

ঘণ্ডালু বল্লে—মঠে পায়রাটাকে পাওয়া যাবে। অন্য পাখীদের সঙ্গে নিশ্চয়ই সে উড়ে গেছে। চলো এখান থেকে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক! কিন্তু বাড়িমুখো রওনা হবার আগে মরা মোষটাকে মাপতে গেলুম—ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি তার উপর এসে বসেছে। সে লম্বায় সাড়ে দশ ফুট—তার সামনের পা তিন ফুটেরও বেশি।

মঠের দিকে চুপচাপ ফিরে চল্লুম। দুপুরের কাছাকাছি যখন গ্রামে গিয়ে পৌছলুম আর মোড়লকে জানালুম তাদের শত্রুর শেষ হয়েছে, তখন সে আশ্বস্ত হল বটে, কিন্তু তাকে ভারি শোকার্ত মনে হল। শুনলুম, আগের দিন সন্ধ্যায় মোষটা তার বুড়ো মাকে মেরে গেছে—ঠিক সন্ধ্যার আগে গাঁয়ের মন্দিরে যাবার পথে।

আমরা ক্ষুধায় কাতর, তাই পা চালিয়ে শীঘ্রই মঠে গিয়ে পৌছলুম। পৌছেই পায়রার খোঁজ করলুম। চিত্রগ্রীব সেখানে নাই! কি ভয়ানক! বুড়ো অধ্যক্ষের কুঠরিতে বসে গল্প করার সময় তিনি বল্লেন—সে (চিত্রগ্রীব) তোমারি মত নিরাপদে আছে, ঘণ্ডালু! কয়েক মিনিট স্থির হয়ে থেকে তিনি প্রশ্ন করলেন—তোমার মনে কিসের অশান্তি ?

প্রাচীন শিকারি আস্তে আস্তে বল্লে—বিশেষ কিছু নয়, মহারাজ! কাউকে মারা আমার মোটেই ভালো লাগে না। মোষটাকে জ্যান্ত ধরবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাকে মেরে ফেলতে হল। যখন তার শিং ভাঙলো, আর আমার ও তার মধ্যে কোনো আড়াল রইলো না, তখন তার মর্মস্থানে একটা শিরার মধ্যে ছুরি বসাতেই হল। ভারি দুঃখ হচ্ছে, তাকে জ্যান্ত ধরে চিড়িয়াখানায় বিক্রি করতে পারলুম না!

"আচ্ছা ব্যবসাদারি বুদ্ধি তোমার যা হোক! মোষটা মরাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। সারাজীবন চিড়িয়াখানায় বন্ধ হয়ে থাকার চেয়ে মরণ ভালো। জ্যান্ত মরার চেয়ে আসলে মরা ভালো নয় কি ?"

ঘণ্ডালু জবাব দিলে, দুটো শিঙের ওপর ফাঁসটা গলাতে ত আর পারলে না!

সাধু বল্লেন যা মরে গেছে তার ভাবনা না ভেবে তোমাদের দুজনেরই চিত্রগ্রীবের কথা ভাবা উচিত!

ঘণ্ডালু বল্লে, আজ্ঞে হাঁ। সে কথা ঠিক, কাল তার খোঁজ করা যাবে।

কিন্তু সাধু বল্লেন, না। দেন্‌তামে ফিরে যাও। তোমাদের বাড়ীতে সবাই ভাবছেন। আমি তাদের ভাবনা শুন্‌তে পাচ্ছি।

পরদিন একজোড়া টাট্টুর পিঠে চেপে আমরা রওনা হলুম। দিনে দুবার করে ঘোড়া বদলে একটানা চলে আমরা তিন দিনে দেন্‌তাম পৌঁছলুম। বাড়ীর দিকে যখন উঠছি তখন আমাদের এক চাকরের সঙ্গে দেখা। তার ভারি উত্তেজিত অবস্থা। সে বল্লে, চিত্রগ্রীব তিন দিন আগে ফিরেছে! তার সঙ্গে আমাদের ফিরতে না দেখে মা-বাবার বিষম ভাবনা—জ্যান্তো বা মরা যে কোনো অবস্থায় আমাদের খুঁজে আনবার জন্য চারিদিকে লোক গেছে।

চাকরের সঙ্গে প্রায় ছুটে বাড়ীমুখো চল্লুম। দশ মিনিটের মধ্যে মায়ের বাহুর মাঝে বাঁধা পড়লুম, আর ঠিক সেই সময়ে চিত্রগ্রীব উড়ে আমার মাথার উপর বসে ডানা ফটফটিয়ে টাল সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

শেষ